প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- আধ্যাত্মিকতার নানা দিক
  মোহাম্মাদ আলী সোমালী
- মানব জাতির পরিপূর্ণ আদর্শ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)
  সংকলন : মিকদাদ আহমেদ
- আলী (আ.)-এর কতিপয় বাণী ও সেগুলোর ব্যাখ্যা
- বিশ্বদৃষ্টি ও ধর্ম
- কোরআনের ঐশী স্বরূপ
  রমজান আলীতাবার ফিরুযজায়ী
- মানবতাবাদ
  আয়াতুল্লাহ মাহমুদ রাজাভী
- মহান আল্লাহর ন্যায়বিচার
- ইমাম খোমেইনী ও ইসলামী বিপ্লব
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধনে সিরিয়া গৃহযুদ্ধের আগুনে জ্বলছে

বর্ষ ৪, সংখ্যা ১-২, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১৩

بسم الله الرحمان الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৪, সংখ্যা ১-২

এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০১৩

সম্পাদক	:	**এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর**
সহযোগী সম্পাদক	:	**ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**
নির্বাহী সম্পাদক	:	**মো. আশিফুর রহমান**
উপদেষ্টামণ্ডলী	:	মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান
		আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
		এস.এম. আশেক ইয়ামিন
প্রকাশক	:	মো. আশিকুর রহমান
প্রকাশকাল	:	বৈশাখ-ভাদ্র ১৪২০
		জমাদিউস সানী-জিলকদ ১৪৩৪
মূল্য :		৫০ (পঞ্চাশ) টাকা
যোগাযোগের ঠিকানা	:	দোকান নং ৩৩৬ (৩য় তলা, দক্ষিণ পার্শ্ব), মুক্তবাংলা
(পরিবর্তিত ঠিকানা)		শপিং কমপ্লেক্স, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

Prottasha (Vol. 4, No. 1-2, April-September 2013), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman; Address: 336 (2nd fl. Right Side), Muktobangla Shopping Complex, Mirpur-1, Dhaka-1216.

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**

  মুসলিম উম্মাহকে তাদের শত্রু-মিত্র চিনতে হবে ৭

- **নীতি-নৈতিকতা**

  আধ্যাত্মিকতার নানা দিক ১১

  মোহাম্মাদ আলী সোমালী

  মানব জাতির পরিপূর্ণ আদর্শ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ১৯

  সংকলন : মিকদাদ আহমেদ

  আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর কতিপয় বাণী ও সেগুলোর ব্যাখ্যা ২৮

  সংকলন : এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

- **ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন**

  বিশ্বদৃষ্টি ও ধর্ম ৪১

  কোরআনের ঐশী স্বরূপ ৫৩

  রমজান আলীতাবার ফিরুযজায়ী

  মানবতাবাদ ৮৯

  আয়াতুল্লাহ মাহমুদ রাজাভী

  মহান আল্লাহর ন্যায়বিচার সংক্রান্ত ধারণা ৯৮

  সংকলন : এস.এম. আশেক ইয়ামিন

- **আপনার জিজ্ঞাসা** ১১৯

- **বিশেষ নিবন্ধ**

  ইমাম খোমেইনী ও ইসলামী বিপ্লব ১২৯

  মো. আবু ওয়াসি

- **বিশ্ব পরিস্থিতি**

  মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধনে সিরিয়া গৃহযুদ্ধের আগুনে জ্বলছে ১৪৩

  মো. মুনীর হোসেন খান

Prottasha
A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 4, No. 1, April-September 2013

Table of Contents

- **Editorial**
  Muslim Ummah Needs to Know its Friends and Foe **7**
- **Ethics**
  Different Treatments of Sprituality **11**
  Dr. Mohammad Ali Shomali
  Hazrat Muhammad (Sm.) : The Complete Ideal of Human Being **19**
  Compilation: Miqdad Ahmed
  Some Speeches of Imam Ali (A.) with exgeration **28**
  Compilation: A.K.M. Anwarul Kabir
- **Theology**
  Worldview and Religion **41**
  Divine Characteristics of the Holy Quran **53**
  Ramdan Ali Tabar Firujjayee
  Humanism **89**
  Ayatollah Mahmud Razavi
  Justice of Allah **98**
  Compilation: S.M. Asheque Yamin
- **Your Question** **119**
- **Special Article**
  Imam Khomeini and Islamic Revolution **129**
  Md. Abu Wasi
- **World Affairs**
  Civil War in Syria by the influence of United States **143**
  Md. Munir Hossain Khan

গ্রাহক চাঁদার হার		
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	৬০ টাকা (প্রতি কপি)	২৪০ টাকা (বাৎসরিক)

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :
মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-৪ (পশ্চিম পাশ, নিচতলা), রোড নং-৩, ব্লক- সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

মুসলিম উম্মাহকে তাদের শত্রু-মিত্র চিনতে হবে

৬

সম্পাদকীয়

মুসলিম উম্মাহকে তাদের শত্রু-মিত্রকে চিনতে হবে

মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বার্মায় দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের ওপর নিপীড়ন ও গণহত্যা চলছে। অধিকাংশ মুসলিম দেশে অরাজকতা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। একদিকে তারা ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে চিন্তাগতভাবে চরম বিচ্যুত এক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে যারা ইসলামের নামে মানবতাবর্জিত সকল কর্মকাণ্ড ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চালিয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের ক্রীড়নক এ গোষ্ঠী নিজেদের সমর্থকদের ব্যতীত সকল মুসলমানকেই কাফের বলে ঘোষণা করে প্রতিদিন শতশত নিরীহ মুসলমান নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করছে। তাদের কাউকে জীবন্ত দগ্ধ করছে, আবার কারো মৃতদেহ থেকে কলিজা বের করে চিবোচ্ছে। এমনকি মহান সাহাবাদের কবরগুলোও তাদের কলুষিত হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। প্রতিদিন তাদের বোমা হামলায় আফগানিস্তান, ইরাক, লেবানন ও পাকিস্তানে মুসলমানরা প্রাণ হারাচ্ছে। আর তাদের এ কাজকে ঐ সকল তথাকথিত আলেম বৈধতা দান করছে যারা ইসলামের শত্রুদের পরম মিত্র মধ্যপ্রাচ্যের রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসকদের তল্পিবাহক।

আজ থেকে চার বছর আগে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যে গণজাগরণ এসেছিল এবং এর ফলশ্রুতিতে যে পাশ্চাত্যের মদদপুষ্ট প্রতিষ্ঠিত কিছু স্বৈরাচারী শাসকের পতন ঘটেছিল তার সুফল এ জাতিগুলো লাভ করতে পারেনি। কারণ, এ আন্দোলনগুলোর নেতারা শক্তিশালী কোন পরিকল্পনার অধিকারী ছিলেন না এবং প্রকৃত শত্রু চিহ্নিত করতেও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। আর তাই শত্রুকে বন্ধু বলে মনে করে শত্রুর পরিকল্পনার ফাঁদে পা দিয়ে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছেন। তাঁরা নিজেদের আন্দোলনগুলোকে ইসলামী বিপ্লব বলে অভিহিত করলেও আদৌ সেগুলোর চরিত্র ইসলামী ছিল না। কারণ, পূর্ববর্তী শাসকদের সাথে তাঁদের পররাষ্ট্রনীতির তেমন কোন পার্থক্যই ছিল না। তাঁরাও খোদাবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদী, বিশ্বগ্রাসী অপশক্তি ও তাদের দোসরদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। অথচ এ বিষয়টি আল্লাহ কর্তৃক তাগুতকে প্রত্যাখ্যানের নির্দেশের (নাহল : ৩৬ ও নিসা : ৬০) সুস্পষ্ট বিরোধী। আর তাঁরা পবিত্র কোরআনের এ আয়াতগুলোও ভুলে গিয়েছিলেন যে, আল্লাহ বলেছেন : 'হে ঈমানদারগণ! ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না; তারা একে অন্যের বন্ধু। আর (স্মরণ রেখ,) তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে প্রকৃতপক্ষে সে তাদের মধ্য হতেই। নিশ্চয় আল্লাহ অবিচারকদের পথ প্রদর্শন করেন না।' (মায়েদা : ৫১) '(হে রাসূল!) অবশ্যই তুমি লোকদের মধ্যে বিশ্বাসীদের প্রতি সবচেয়ে শত্রুতা পোষণকারী হিসেবে ইহুদি ও মুশরিকদের পাবে।' (মায়েদা : ৮২) ইসলামের শত্রুদের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের মাশুল এখন তাদের দিতে হচ্ছে।

কিন্তু এ ঘটনাগুলো থেকে তাঁদের শিক্ষা নেয়ার সুযোগ এসেছে। তাঁদের খতিয়ে দেখতে হবে কী কারণে ব্যর্থ হয়েছেন? তাঁদের দেখতে হবে মুসলমানদের প্রকৃত শত্রু কারা? কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান বিগত পঞ্চাশ বছরে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? কারা মুসলিম বিশ্বের ভূখণ্ডগুলোকে ইসলামের শত্রুদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে দিয়েছে? কারা এ দেশগুলোতে ইসলামের শত্রুদের প্রবেশের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে? কাদের তেল দিয়ে ইসরাইলের ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধবিমানগুলো ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা চালিয়েছে? কারা ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতন ও অবিচার দেখেও নিঃশ্চুপ থেকেছে? কারা ইসলামের নামে কাদের স্বার্থে আলকায়েদা, তালেবান, আলমুকাতালাতুল ইসলামীয়া, হিযবুন্নুর, জেবহাতুন নুসরাসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী দল তৈরি করেছে ও তাদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করছে? কারা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সালাফী-অসালাফী, হাম্বালী-অহাম্বালী, শিয়া-সুন্নি ইত্যাদি মাজহাবী পার্থক্যগুলোকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের রূপ দানে উঠে পড়ে লেগেছে? কারা ইসরাইল ও আমেরিকার কূটনীতির সঙ্গে নিজেদের পররাষ্ট্রনীতিকে খাপ খাইয়ে চলছে? কাদের পররাষ্ট্রনীতি পাশ্চাত্য ও ইসরাইলের হাতকে শক্তিশালী করছে? কারা বাহরাইন ও ইয়েমেনে নিজের দেশের নাগরিকদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সকল গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারকে পদদলিত করছে? কারা ইরান, ইরাক, সুদান, সিরিয়াসহ ইসরাঈলবিরোধী বিভিন্ন দেশের সরকার পতনের আমেরিকান পরিকল্পনার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে? কাদের অর্থে কেনা অস্ত্র ও বোমায় আফগানিস্তান, ইরাক ও পাকিস্তানে সাধারণ নাগরিকরা নিহত হচ্ছে? এ সকল আত্মঘাতি কর্মকাণ্ডে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? মুসলমানদের শত্রুরা নাকি মুসলমানরা? যারা গতকাল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে মধ্যপ্রাচ্যে শিয়াবলয় সৃষ্টির ভয় দেখাতো তারাই কি আজ তিউনিসিয়া থেকে তুরস্ক ও সিরিয়া পর্যন্ত ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বলয়ের ভীতি প্রদর্শন করছে না? যদি এমন কোন বলয় সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে তবে তা কাদের জন্য ভীতির কারণ? মধ্যপ্রাচ্যের সাধারণ মানুষদের নাকি জনসমর্থনহীন রাজতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী ও তাদের বন্ধুদের জন্য? এ সব প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুসলমানদের প্রকৃত শত্রুদের পরিচয়?

বর্তমানে ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা তাদের বৃহত্তর দলগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে পরিণত করার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে চায়। যেমন তারা সুন্নিদের মধ্যে আরব, তুর্কি, কুর্দি, পাখতুন, তাজিক, বালুচ ইত্যাদি বিভিন্ন দলে বিভক্ত করছে তেমনি তারা শিয়াদের মধ্যে পাশ্চাত্যের চক্ষুশূল এমন ধর্মীয় নেতৃবর্গ যারা এক বিপ্লবকে তিন যুগেরও অধিক সময় ধরে পরাশক্তিবর্গের পাহাড়সমূহকে উৎপাটিত করার ন্যায় ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে টিকিয়ে রেখেছেন তাঁদের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে প্রতিরোধ শক্তিকে বিচলিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। এ অবস্থায় মুসলমানদের সকল দল ও গোষ্ঠী যদি সচেতন হয়ে শত্রুর প্রচেষ্টাকে সঠিকভাবে শনাক্ত করে এবং মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়, তবেই তারা সফলতা লাভ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

নীতি-নৈতিকতা

আধ্যাত্মিকতার নানা দিক

মানব জাতির পরিপূর্ণ আদর্শ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর
কতিপয় বাণী ও সেগুলোর ব্যাখ্যা

আধ্যাত্মিকতার নানা দিক

মোহাম্মাদ আলী সোমালী

এ প্রবন্ধে আমরা জানব, কীভাবে কুরআন ও হাদীস আত্মোন্নয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং ধার্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতা অর্জনে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও সংগ্রামকে বর্ণনা করেছে।

১. আধ্যাত্মিকতা : নিজ সত্তার সাথে যুদ্ধ করা

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মগঠন হলো নিজের মধ্যস্থিত একটি শত্রুর বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ। একটি সুপরিজ্ঞাত ও উৎসাহব্যঞ্জক হাদীসে বলা হয়েছে যে, মদীনায় মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবিদের একটি দলকে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসতে দেখলেন। তিনি তাঁদের বললেন : সাবাস! যারা ছোট যুদ্ধ সমাপন করেছ তাদের স্বাগতম এবং যাদের বড় যুদ্ধ এখনও দায়িত্বে রয়ে গেছে।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো : 'বড় জিহাদ কোন্‌টি? তিনি জবাব দিলেন : 'নিজের নাফ্‌স এর সাথে যুদ্ধ।'[১]

সাহাবিরা একটি মহাযুদ্ধে তাঁদের শত্রুদের পরাজিত করেছিলেন এবং ইসলামের প্রতিরক্ষায় তাঁদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় তাঁদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাঁরা আশ্চর্যান্বিত এবং বিস্মিত হয়েছিলেন যে, কোন্ বিষয়টি তার চেয়েও বড় হতে পারে। মহানবী (সা.) জবাব দিলেন : 'জিহাদ আন্ নাফ্‌স'। এর অর্থ হলো কারো নিজ সত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা– নিজের সত্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

অপর একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু যার রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : 'কোন্ জিহাদ সবচেয়ে বড়?' মহানবী (সা.) জবাব দিলেন : 'নিজ সত্তা এবং কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।'[২]

আত্মোন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের বিষয়টির মূল অবশ্যই কুরআনে নিহিত। যেমন কুরআন মজীদ বলছে :

وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفۡسِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

'আর যে কেউ চেষ্টা-সাধনা (জিহাদ) করে সে তো নিজের জন্যই চেষ্টা-সাধনা করে; নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্ববাসী হতে অমুখাপেক্ষী।' (সূরা আনকাবুত : ৬)

কুরআনের অনেক তাফসীর অনুযায়ী এখানে চেষ্টা বা সংগ্রাম (জিহাদ) বলতে আধ্যাত্মিক জিহাদকে বুঝানো হয়েছে। তাফসীরকারগণ এটি প্রমাণ করার জন্য দু'টি দলিল ব্যবহার করেন। প্রথমত 'নিজের জন্য' শব্দটির ব্যবহার; এটি হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা, একজন সৈন্য কোন একটি কারণে যুদ্ধ করে– এটা হতে পারে অত্যাচারিতদের পক্ষে অথবা হতে পারে ইসলামের সম্মানের জন্য অথবা তার দেশের জন্য। যা-ই হোক এ আয়াত কারণটিকে 'নিজের জন্য' বলে উল্লেখ করেছে। দ্বিতীয়ত, এ আয়াতের পূর্বে আল্লাহ্ বলেন :

مَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأٓتٖۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٥

'যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশী (সে যেন প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কারণ,) আল্লাহর নির্ধারিত মেয়াদ অবশ্যম্ভাবী; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা আনকাবুত : ৫)

আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের এ ধারণাও একটি আধ্যাত্মিক বিষয়। আর এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী আয়াতটিও (সূরা আনকাবুত : ৬)– যেটি নিজের জন্য জিহাদ করা সম্পর্কিত, সেটিও একটি আধ্যাত্মিক বিষয়। অবশ্য এটি এমন নয় যে, এ আয়াত সশস্ত্র যুদ্ধকে শামিল করে না, কিন্তু এটি আধ্যাত্মিক জিহাদকেও শামিল করে। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোও আধ্যাত্মিক জিহাদ সম্পর্কিত, যদিও এগুলো সশস্ত্র জিহাদকেও শামিল করতে পারে, যেহেতু সশস্ত্র জিহাদের ক্ষেত্রেও নিয়্যত ও আত্মার শুদ্ধতার প্রয়োজন রয়েছে।

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ

'এবং প্রকৃত জিহাদের দাবি অনুযায়ী আল্লাহর পথে জিহাদ কর...' (সূরা হজ : ৭৮)

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩

'যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমরা তাদের অবশ্যই আমাদের পথসমূহের নির্দেশনা দান করব; এবং নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যকর্মশীলদের সাথি।' (সূরা আনকাবুত : ৬৯)

অভ্যন্তরীণ শত্রুর সাথে যুদ্ধ সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। কারণ, এটি আরও কঠিন। যখন কোন শত্রু অভ্যন্তরে খুঁজে পাওয়া যায় তখন তা আরও বিপজ্জনক এবং তাকে পরাজিত করা আরও কঠিন। একটি গৃহযুদ্ধ সীমান্তে বহিঃশত্রুর সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে বেশি কঠিন। আমাদের ঘরের বাইরে অবস্থানকারীদের বিতাড়ন করা অপেক্ষা আমাদের ঘর জবর-দখলকারীদের বিতাড়ন করা কঠিন। যদি আমাদের শত্রু আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে সে আমাদের সকল গোপন বিষয় জানে। সে আমাদের দুর্বল ও শক্তিশালী বিষয়গুলো জানে এবং সে জানে কীভাবে আমাদের সাথে খেলতে হবে। অভ্যন্তরীণ শত্রু সবসময় আমাদের সাথে থাকে এবং আমাদেরকে কোন অবসর দেয় না। আমরা হয়ত বহিঃশত্রুর সাথে সন্ধি করার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি করতে পারি, কিন্তু অভ্যন্তরীণ শত্রুর সাথে দিবারাত্রি বিরামহীনভাবে সংঘাত চলতে থাকে। আর দুর্ভাগ্যবশত আমরা এ শত্রুকে ভালোবাসি আর সম্মানও করি, কারণ, এটা আমাদের নিজেদেরই আত্মা। অনেক খারাপ কাজই সে সম্পন্ন করেছে, তারপরও আমরা তাকে ভালোবাসি। অতএব, এটি একটি খুবই কঠিন ও জটিল সংগ্রাম। তাই আমাদেরকে দৃঢ়চিত্ত এবং পুরোপুরি সতর্ক হওয়া উচিত। যদি আমরা এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি, তবেই আল্লাহ্ আমাদের ওপর দয়া করবেন।

আমাদের জানা উচিত যে, এ সংগ্রামে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও পরিশেষে তা এতটা কঠিন নয়। যারা সত্যিই এ যুদ্ধে জয়ী হতে চায়, আল্লাহ্ তাদের পথনির্দেশ করবেন এবং তাদের জন্য বিষয়টি সহজ করে দেবেন। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যখন আমরা কিছু জানি তখন অবশ্যই আমাদের তা অনুশীলন করা প্রয়োজন। যদি আমরা আমাদের জ্ঞানের ব্যবহার করি, তাহলে আল্লাহ্ আমাদেরকে আমরা যা জানি না, সে বিষয়ের জ্ঞান আমাদের দান করবেন। যদি আমরা আমাদের স্বল্প-জানা বিষয়গুলোকে অনুশীলন করি, তাহলে তা আমাদের সামনের পথকে আলোকিত করে দেবে।

২. ঔষধ হিসাবে আধ্যাত্মিকতা

আরেকটি দৃষ্টিকোণ হলো আধ্যাত্মিকতাকে আমাদের আত্মার জন্য এক ধরনের ঔষধ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলোকে অসুস্থতা হিসাবে বর্ণনা করা

হয়েছে আর তাই আমাদের জন্য বিশেষ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা রোগগ্রস্ত হলে আমাদের নিরাময়ের প্রয়োজন রয়েছে, আমাদের ওষুধের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের শরীরের মতো আমাদের আত্মাও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। দুর্ভাগ্যবশত অসুস্থতার সবচেয়ে কঠিন অবস্থা হলো যখন আমরা (অন্তরের) গভীর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ি। পবিত্র কুরআন দশটি আয়াতে মানুষের একটি দল সম্পর্কে বলেছে যাদের হৃদয়ে রোগ রয়েছে। এই রোগ আল্লাহ্ কর্তৃক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কারণ, তারা এ রোগ থেকে মুক্তি পেতে চায় না এবং অসুস্থ থাকাতেই সন্তুষ্ট থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা কুরআন মজীদে পাঠ করি :

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ

'তাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি (পূর্ব থেকেই) রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।' (সূরা বাকারা : ১০)

পবিত্র কুরআন সুস্থ ও পবিত্র হৃদয় সম্পর্কেও কথা বলে :

وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

'এবং যেদিন তারা (মানুষ) পুনরুত্থিত হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত কর না, যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকার সাধন করবে না, তার জন্য ব্যতীত যে (সেদিন) বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে।' (সূরা শুআরা : ৮৭-৮৯)

এটি ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রার্থনা। সূরা সাফফাত-এর ৮৩ এবং ৮৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ আমাদের জানাচ্ছেন যে, এ প্রার্থনা কবুল করা হয়েছে : 'এবং নিশ্চয় ইবরাহীম তার (হযরত নূহের) অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন সে তার প্রতিপালকের নিকট বিশুদ্ধ চিত্তে উপস্থিত হয়েছিল।'

সুতরাং, আমরা বুঝতে পারি যে, একটি সুস্থ ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো নবী, যিনি একেশ্বরবাদী সকল ধর্মের পিতা, তিনি আল্লাহ্র কাছে এর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

নিশ্চয়ই, এটাই একমাত্র জিনিস যা কিয়ামতের দিন উপকারে আসবে যখন আর কোন কিছুই কোন উপকারে আসবে না– না সন্তান, না অর্থ। ইমাম আলী (আ.) বলেন :

أَلَا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلاَءِ الْفَاقَةَ وَ أَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ

'একজন মানুষের ওপর অন্যতম যে বিপদ আপতিত হয় তা হলো দারিদ্র্য, কিন্তু দারিদ্র্যের চেয়েও কঠিন হলো অসুস্থতা। আর শারীরিক অসুস্থতার চেয়েও কঠিন হলো অন্তরের অসুস্থতা।' (নাহজুল বালাগা, ৩৮৮ নং খুতবা)

সুতরাং সবচেয়ে খারাপ দারিদ্র্য হলো ধর্মানুরাগের ঘাটতি। এ প্রসঙ্গে 'ঔষধ তত্ত্ব'ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইমাম আলী (আ.) তাঁর ভাষণে ধার্মিকদের সম্পর্কে বলেন :

أَمَّ اللَّيْلَ فَصَافُّوْنَ أَقْدَامَهُمْ تَالِيْنَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهَا تَرْتِيْلاً يُحَزِّنُوْنَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَ يَسْتَثِيْرُوْنَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ

'(ধার্মিক লোকেরা হলো) তারা যারা রাত্রিতে দণ্ডায়মান হয় (নামায পড়ে) এবং কুরআন পাঠ করে এবং তারা নিজেদেরকে ব্যথিত করার চেষ্টা করে। তারা তাদের অসুস্থতার জন্য কুরআন থেকে ঔষধ হিসাবে চিকিৎসা নেওয়ার চেষ্টা করে।'[৩]

জাবির ইবনে ইয়াযীদ জু'ফীকে ইমাম বাকের (আ.) বলেন :

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا عِلْمَ كَطَلَبِ السَّلاَمَةِ وَ لَا سَلَامَةَ كَسَلاَمَةِ الْقَلْبِ

'এবং জেনে রাখ যে, সুস্থতা কামনা করার জ্ঞানের মতো কোন জ্ঞান নেই এবং আত্মার সুস্থতার মতো কোন সুস্থতা নেই।'[৪]

আধ্যাত্মিক ঔষধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো : আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের আত্মায় রোগ প্রবেশে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হবে এবং একইভাবে আমাদেরকে অসুস্থ লোকদের থেকেও দূরত্ব বজায় রাখতে হবে যেন সেই রোগ আমাদের সংক্রমিত না করে; তাদের সান্নিধ্যে আমরা আমাদের শরীরকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করব। যা হোক, আমাদের রোগ থেকে মুক্তির পথ রয়েছে, যেহেতু আল্লাহ্ হলেন পরম ক্ষমাশীল। উপরন্তু আমাদের একজন পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন রয়েছে, যিনি আমাদের কী করতে হবে, কীভাবে রোগ প্রতিরোধ করতে হবে অথবা অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে হবে, তা দেখাতে পারেন। ইমাম আলী (আ.) হযরত

মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে একটি চমৎকার কথা বলেছেন। আর তা হলো, তিনি একজন ডাক্তার, কিন্তু তিনি অসুস্থ মানুষের জন্য অপেক্ষা করেননি; বরং তিনি তাঁর উপায়-উপকরণ সাথে নিয়ে নিজেই তাদের কাছে গিয়েছেন।

طَبِيْبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ حِيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ قُلُوْبٍ عُمْيٍ وَ آذَانٍ صُمٍّ وَ اَلْسِنَةٍ بُكْمٍ مُتَتَبِّعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ

'মহানবী (সা.) একজন ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকের মতো ছিলেন যিনি তাঁর মলম প্রস্তুত রেখেছিলেন এবং যন্ত্রপাতি উত্তপ্ত রেখেছিলেন। যখনই কোন অন্ধ হৃদয়, বধির কান এবং মুক জিহ্বার সুস্থতার প্রয়োজন হয়েছে তিনি সেগুলো ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর ঔষধসহ গাফলতি ও জটিলতার স্থলে উপস্থিত হতেন।'[৫]

সে সময় এমন মানুষ ছিল যারা বধির, অন্ধ অথবা এমন যারা সত্য বলতে পারত না এবং মহানবী (সা.) তাদেরকে সুস্থ করার জন্য উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করতেন।

৩. ভ্রমণ হিসাবে আধ্যাত্মিকতা

ইসলামী সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতাকে একটি ভ্রমণ হিসাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা আমাদেরকে একজন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী বলে মনে করতে পারি। আমরা সবাই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে দূরে (বস্তুজগতের দিকে) যাত্রা শুরু করেছিলাম অর্থাৎ তাঁর নিকট থেকে পৃথিবীতে এসেছি এবং তারপর আমরা আবার তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আমরা সকলেই আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছি এবং এই সৃষ্টি আমাদের মূল থেকে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা। আমরা সৃষ্টির আগে আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম না, কিন্তু এখন আমরা বিচ্ছিন্ন। যা হোক, আল্লাহ্ আমাদের তাঁর দিকে ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছেন। কুরআন বলছে :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যই এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাগমনকারী।' (সূরা বাকারা : ১৫৬)

যখন আমরা মৃত্যুবরণ করব, তখন আমাদের গন্তব্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দিক সম্পর্কে খুবই সতর্ক

থাকতে হবে। যদি আমরা সঠিক পথে থাকি, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবেই আমাদের গন্তব্যে পৌঁছব। কিন্তু যদি আমরা ভুল পথে থাকি, তাহলে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারব না এবং তা থেকে দূরে, আরও দূরে চলে যাব। আসলে আমরা কোন একটি অবস্থানে স্থির নই। প্রতি দিন এবং প্রতি ঘণ্টায় আমরা পথ চলছি এবং আমাদের গন্তব্যের নিকটে যাচ্ছি অথবা দূরে সরে যাচ্ছি। পবিত্র কুরআন বলছে :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَـٰقِيهِ ۝٦

'হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করে থাক এবং তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করবে।' (সূরা ইনশিকাক : ৬)

এ আয়াত পাঠে কেউ হয়ত মনে করতে পারে যে, চিন্তিত হওয়ার কোন কিছু নেই, কারণ, আমরা সকলেই একটি ভালো জায়গা থেকে এসেছি এবং সামনে একটি ভালো গন্তব্যস্থল রয়েছে। কিন্তু যখন আমরা আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হব তখন আমাদের অবস্থাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছানোর দু'টি অবস্থা রয়েছে : তাঁর কাছে এমন অবস্থায় পৌঁছানো যখন তিনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং যখন তিনি আমাদের ওপর রাগান্বিত। মানুষ হলো সেসব অল্পসংখ্যক সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত যাদের পূর্ণতার স্তর স্থির নয়; তাদেরকে নিজেদের অবস্থাকে উন্নীত করা বা অবনমিত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

সুতরাং, আধ্যাত্মিক সফর গঠিত হয় আমাদের আল্লাহ্‌র নৈকট্য বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টার দ্বারা। এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ সবসময় আমাদের নিকট রয়েছেন, কিন্তু আমরা তাঁর কাছাকাছি নই। আমরা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে একটি অবস্থানে পৌঁছতে পারি যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আরও নিকটবর্তী হতে পারি এবং পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মতো তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরা সাধারণভাবে নিজ সত্তাকে আল্লাহতে বিলীন করার কথা বলেন। আমি এখানে এ মতবাদ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করব না। কিন্তু যে কোন দিক থেকেই এটি নিশ্চিত যে, আমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নিকটবর্তী হতে পারি এমনভাবে যে, যেখানে তাঁর আর আমাদের মধ্যে কোন কিছুই থাকবে না এবং আমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন বলতে এটাই বুঝি।

সুতরাং এ জীবনটা একটা সফর এবং আমরা বলতে পারি না যে, আমরা এ সফরে যেতে চাই না। আমরা সকলেই এ সফরে রয়েছি এবং আমাদের দায়িত্ব হলো অনেক সঞ্চিতি তৈরি করা। আত্মগঠনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো আল্লাহ্‌র দিকে যাত্রার মাধ্যমে এ দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা। তাঁর পথে যাত্রা হলো অসীম এবং চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ। যা হোক, যারা এ সফরে যাত্রা শুরু করেছে, তাদের জন্য সব ধরনের সমর্থন এবং পথনির্দেশনা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে ইমাম সাজ্জাদ (আ.) বলেন:

سُبْحَانَكَ مَا اضيق الطرق على من لم تكن دليله و ما اوضح الحق عند من هديته سبيله

'আপনি কত পবিত্র! কত সংকীর্ণ পথ তার জন্য যাকে আপনি পথ প্রদর্শন করেন না এবং কত স্পষ্ট একটি পথ তাদের জন্য যাদেরকে আপনি পথ প্রদর্শন করেছেন।'[৬]

উপসংহার : এ অংশে আমরা আধ্যাত্মিকতাকে অথবা আত্মগঠনকে একটি যুদ্ধ হিসাবে, একটি ঔষধ হিসাবে এবং একটি সফর হিসাবে আলোচনা করেছি। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সামনে নানা উপমা উপস্থাপন করে উৎসাহ দিচ্ছেন এবং পথনির্দেশ করছেন। তিনি আমাদের দেখাচ্ছেন যে, তাঁর নৈকট্য লাভের আশা সবসময়ই রয়েছে এবং তিনি নানাভাবে আমাদেরকে তাঁর নৈকট্য লাভের ব্যাপারে উৎসাহ দিচ্ছেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল।

অনুবাদ : মো. আশিফুর রহমান

তথ্যসূত্র

১. আল-কাফি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২, নং ৩ এবং শেখ সাদূক সংকলিত আল-আমালি, অধ্যায় ৭১, পৃ. ৩৭৭, নং ৮।
২. নাহজুল বালাগা,
৩. নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১৯৩
৪. তুহাফুল উকূল, পৃ. ২৮৪
৫. নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১০৭
৬. মাফাতিহুল জিনান, মুনাজাতে মুরিদীন।

(তেহরান থেকে প্রকাশিত ম্যাসেজ অব সাকালাইন, ভলিউম ১০, নং ৩, অটাম ১৪৩০/২০০৯ থেকে অনুবাদিত।)

মানব জাতির পরিপূর্ণ আদর্শ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)

সংকলন : মিকদাদ আহমেদ

প্রতিটি মানুষের অন্তরে বড় হবার আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত থাকে। মানুষের জীবনের একটি লক্ষ্য থাকে যেখানে সে পৌঁছতে চায়। বড় হবার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে একটি কাল্পনিক আদর্শ মানুষের মনে দানা বাঁধে। সে স্বভাবত কোনো অনিশ্চিত অবস্থার দিকে অগ্রসর হতে পছন্দ করে না বলেই তার রুচি অনুযায়ী অন্য কোনো যোগ্য মানুষকে আদর্শ হিসেবে বেছে নেয় এবং তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়।

যেমন কোনো তরুণ ডাক্তার একজন ভালো ডাক্তারকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থনীতির একজন ছাত্র একজন বড় অর্থনীতিবিদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। এভাবে দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ ঠিক করে নেয়। কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুযায়ী একজন মানুষের যখন পূর্ণ মানব হিসেবে গড়ে ওঠার প্রশ্ন সেখানে এমন খণ্ডিত আদর্শ মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আদর্শ নির্ধারণ করার বিষয়টি এজন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আদর্শের বিষয়টি একটি মাত্র জায়গায় কেন্দ্রীভূত থাকে না। এটা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। মানুষ আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিকে প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্ধের মতো অনুকরণ ও অনুসরণ করতে থাকে। তার চলাফেরা, কথা বলার ধরন, আচার-ব্যবহার, এমনকি তার খাবারের মেনু, খাবার গ্রহণের স্টাইল ইত্যাদিও অনুসরণের বিষয় হয়ে পড়ে।

কিন্তু আদর্শ মানুষের অন্ধ অনুসরণ মানুষের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। একজন ডাক্তার, ডাক্তার হিসেবে আদর্শ হতে পারেন, কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তিনি আদর্শ নাও হতে পারেন, আবার একজন আদর্শ রাজনীতিবিদ পারিবারিক দিক দিয়ে আদর্শ নাও হতে পারেন। এমনকি কোনো এক ক্ষেত্রের আদর্শ ব্যক্তি অন্য একটি বিষয়ে ঘৃণ্যও হতে পারেন। আর বিপদটা আসে এখানেই। যখন কোনো ব্যক্তিকে আদর্শ মেনে নেয়া হয়, তখন তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং এ ভালোবাসা আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিত্বের খারাপ দিকগুলোকে উপেক্ষা করতে শেখায়

অথবা সেগুলোকে বৈধতা দেয়ার জন্য বা সেগুলোকে ভালো কাজ বলে গ্রহণ করার জন্য মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশে অগণিত মানুষ আদর্শ হিসেবে মানছে হয়তো শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিক বা তথাকথিত মানবতাবাদী ব্যক্তিত্বকে। তাঁরা যা বলেছেন, এরা তা অবলীলায় মেনে নিচ্ছে। যেমন ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের কলম চলে না, তাঁরা বাকরুদ্ধ। এর বিপরীতে ইসরাইলি দখলদারদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন তাদের দৃষ্টিতে হলো সহিংসতা। তাঁদেরকে যারা আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে, তাদেরও একই সুর।

আবার নারী জাতিকে প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা নয়; বরং নারীকে বেপর্দা করাই তাঁদের দৃষ্টিতে নারীমুক্তি। তাঁদের আদর্শের অনুসারীদের কাছেও তাই নারীমুক্তির সংজ্ঞা হলো বেপর্দা হওয়া।

এভাবে আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তির অযৌক্তিক কাজ বা কথাকে তাঁদের অনুসারীরা ভালো বলে গ্রহণ করতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একজন আদর্শ ব্যক্তি পাওয়া নিঃসন্দেহে খুব কঠিন বিষয়। কারণ, মানুষের জীবনের পরিব্যাপ্তি এত ব্যাপক যে, এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে। আবার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আদর্শ স্থাপন করা আরো কঠিন।

পারিবারিক জীবনে একজন মানুষকে অসংখ্য সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়। পরিবারে কখনো সে সন্তান, কখনো পিতা বা মাতা, কখনো ভাই বা বোন, কখনো স্বামী বা স্ত্রী। এভাবে সমাজে নানা রকম সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তার জীবন অতিবাহিত হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে তার ভূমিকাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রতিটি ভিন্ন অবস্থানে নিজেকে আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব?

একজন প্রতিবেশী হিসেবে সমাজের জন্য কতটুকু আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? মানুষের সাথে লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজের আইন-কানুন মেনে চলা, ওয়াদা পালন, সমাজে নেতৃত্ব দান বা কারো আনুগত্য পালন এত বিস্তৃত ক্ষেত্রে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব নয় কি?

রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, সন্ধি, যুদ্ধ ঘোষণা, আন্তর্জাতিক নীতি মেনে চলা– প্রতিটি বিষয়ে মানুষ কতটুকু সচেতন হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আদর্শ হতে পারে? এগুলো অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও প্রতিটি বিষয় সম্বলিত পরিপূর্ণ আদর্শ হওয়া কি সম্ভব? অথচ মানব জীবনের পূর্ণতার প্রশ্নে এমন ব্যক্তিই তো আদর্শ হবেন যার মধ্যে পূর্ণতার সবগুলো দিক সমন্বিত হয়েছে। তিনি একদিকে আদর্শ রাজনীতিবিদ, আদর্শ আইনপ্রণেতা, আদর্শ সেনাপতি, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, আদর্শ সংস্কারক, আদর্শ অর্থনীতিবিদ, অন্যদিকে আদর্শ মানবতাবাদী, আদর্শ প্রতিবেশী এবং আদর্শ গৃহকর্তাও।

কে এমন ব্যক্তি যিনি এ সবগুলো গুণের আধার হতে পারেন? আসলেই কি সম্ভব এমন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া? এটা কখনই সম্ভব নয় যদি এর পেছনে মহান আল্লাহর সাহায্য না থাকে। পৃথিবীতে যাঁরাই এমন আদর্শ হয়েছেন তাঁরাই মহান আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থাপনায়ই এমন হয়েছেন। অবশ্য আল্লাহর এ বিশেষ ব্যবস্থাপনার আওতায় নিজেকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা তাঁদেরকে করতে হয়েছে, আর আল্লাহ তাঁদের কবুল করেছেন।

আমাদের আদর্শ তাই আল্লাহ তা'আলার সেসব বান্দা যাঁরা তাঁর বিশেষ রহমতের ছায়ায় স্থান পেয়েছেন। তাঁরা হলেন নবী-রাসূল ও ইমামগণ। আর তাঁদের শীর্ষস্থানীয় হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

মহানবী (সা.) ব্যতীত অন্যান্য নবী-রাসূলগণও আমাদের আদর্শ। কিন্তু তাঁদের পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাস আমাদের মাঝে নেই। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে বেশি বর্ণনা করেছেন মূসা (আ.)-এর ঘটনা। এ বর্ণনাগুলো থেকে আমরা মূসা (আ.)-এর সাহস, তাঁর সংগ্রামী জীবন, ফিরআউনের সাথে তাঁর বিতর্ক সম্পর্কে জানতে পারি। তাঁর জন্ম ও ফিরআউনের গৃহে আশ্রয় লাভের কিছু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছাড়া তাঁর জীবনযাপন প্রণালী এবং অন্যান্য দিক আমাদের নিকট অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ঈসা (আ.) সবার ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। বিভিন্ন বর্ণনা যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে তারও অনেকাংশ বানোয়াট ও বিকৃত কাহিনীতে ভরা। কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম থেকে

ওফাত পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনী আমরা জানতে পারি। আর এর মধ্যেই আমরা পূর্ণতায় পৌঁছানো এক অসাধারণ সত্তাকে খুঁজে পাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে যাঁকে উদ্দেশ্য করে বলছেন :

إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'- সূরা কালাম : ৪

অন্যদিকে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মানব জাতির উদ্দেশে বলছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'নিশ্চয়ই রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।'- সূরা আহযাব : ২১

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের আদর্শের ঠিকানা পেয়ে যাচ্ছি।

অন্যান্য নবী-রাসূলে জীবনে কোনো কোনো দিক প্রকাশিত হয়েছিল অধিক মাত্রায়। কিন্তু রাসূলের মধ্যে মানব জীবনের প্রতিটি দিকের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটেছিল। যেমন বলা হয়েছে : হযরত নূহ (আ.)-এর জীবন ছিল কুফ্‌র ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে আন্তরিক ঘৃণা, সীমাহীন ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনে দেখা যায় অলীক উপাস্য ও দেবতাগণের উচ্ছেদ এবং প্রতিমার ধ্বংস সাধন করার মহান দৃশ্য। হযরত মূসা (আ.)-এর জীবন নির্ভিকতা, ন্যায়ের খাতিরে সংগ্রাম এবং আল্লাহর আইন-কানুন প্রচলন করার দৃষ্টান্ত। হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন নম্রতা, ক্ষমা, ধৈর্যধারণ এবং কৃচ্ছ্র সাধনার উত্তম শিক্ষা। হযরত সোলাইমান (আ.)-এর জীবন বাদশাহী শান-সওকত এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোরম ক্ষেত্র। হযরত আইউব (আ.)-এর জীবন সহনশীলতা, ধৈর্য ও শুকরিয়ার নমুনা। হযরত ইউনুসের জীবন অনুশোচনা, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত। কিন্তু এ সকল নবীর গুণাবলি সবই রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে। আর এসব গুণের সর্বোচ্চ প্রকাশস্থলই হচ্ছেন তিনি।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) বলেছেন : 'মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন শৈশবে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম এবং বয়স্কাবস্থায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র। তিনি ছিলেন স্বভাব-চরিত্রে পবিত্র ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র।'

খতীব বাগদাদী আত তারিখুল জামে গ্রন্থে একটা যাইফ (দুর্বল) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করে লিখেছেন, প্রিয় নবীর জন্মের পরই একটি গায়েবী আওয়াজ এসেছিল যে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহকে নিয়ে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করো, তাঁকে সমুদ্রের অতল তলে, প্রত্যেক জঙ্গল-প্রান্তরে, পর্বতসমূহের গুহায় নিয়ে যাও যাতে পৃথিবীর জ্বীন, ইনসান, জীবজন্তু, পশুপাখি, উদ্ভিদ এবং প্রস্তর কাঁকর সবকিছু তাঁকে চিনে নেয় এবং তারা অবহিত হয় যে, পৃথিবীতে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁর মধ্যে সব সৎ গুণের সমাবেশ বিদ্যমান। অতঃপর বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন যে, আদমের স্বভাব, নূহের শৌর্য, শিশের দিব্যজ্ঞান, ইবরাহীমের প্রেম, ইসমাইলের ত্যাগ, ইসহাকের তুষ্টি, সালেহের সুভাষণ, লূতের বিবেক, মূসার দৃঢ়তা, আইউবের ধৈর্য, ইউনুসের আত্মসমর্পণ, ইউশার সংগ্রাম, দাউদের মধুস্বর, দানিয়ালের ভালোবাসা, ইলইয়াসের সৌম্য, ইয়াহইয়ার পবিত্রতা এবং ঈসার তপস্যা একত্র করে তাকে এসব চরিত্রের মধ্যে ডুবিয়ে তোল (চরিত্র দ্বারা বিভূষিত কর)।

অনেক আলেম এ হাদীস নিজেদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, যদিও তা দুর্বল। তাঁদের উদ্দেশ্য শুধু এটা বলা যে, সব নবীর গুণের পূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে। (মাওলানা মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান নদভী প্রণীত, আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বনবীর বিপ্লবী জীবনী, ইনকিলাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩)

আর বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে পরিচিত করানোর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তাঁর জন্মের আবির্ভাবের সংবাদ প্রদানকেই এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্যান্য নবী যেসব সৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, শেষনবী (সা.)-এর মধ্যে তার সবগুলোই একসঙ্গে সন্নিবেশিত হয়েছে। সাধারণ মানব জীবনে এক ব্যক্তির মধ্যে একই সময় এতগুলো পরস্পর বিপরীত গুণের সমাবেশ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তিনি এমন একটি রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন যেখানে একদিকে রাশি রাশি ধনদৌলত উট বোঝাই হয়ে তাঁর দরবারে স্তূপীকৃত হচ্ছিল, অপরদিকে তিনি এত অভাবগ্রস্ত যে, দিনের পর দিন তাঁর বাড়িতে চুলায় আগুন জ্বলেনি এবং তাঁর ঘরে অনাহার-অর্ধাহার চলছিল। তিনি এমন রণবিশারদ যে অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে বিপুল অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত বিরাট বাহিনীর সাথে সংগ্রাম করে বিজয়ী হয়েছিলেন। তিনি এত শান্তিপ্রিয় ছিলেন যে, হাজার হাজার প্রাণ উৎসর্গকারী পরাক্রান্ত বীর বাহিনী সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও বিনা

দ্বিধায় সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দান করেছিলেন। তিনি এত নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন যে, শত-সহস্র সৈনিকের মোকাবিলায় একাই অটল ও অবিচলভাবে দণ্ডায়মান থাকতেন। তিনি এত দয়ার্দ্র ছিলেন যে, সারা জীবনে কাউকে তিনি নিজের কারণে ধমকও দেননি। তিনি দায়িত্ববোধে এমন সজাগ ছিলেন যে, সারা দেশের তুচ্ছ-বৃহৎ ঘটনা ও সমস্যার খবর রাখতেন এবং তার প্রতিকার ও সমাধানের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তিনি একদিকে এতটা সম্বন্ধহীন ছিলেন যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো সাথে সম্পর্ক রাখতেন না। অপরদিকে এত ঘনিষ্ঠ যে, স্ত্রী-পরিজনের খেয়ালে, প্রতিবেশীর চিন্তায়, গরীব-দুঃখীদের ভাবনায় এবং দুনিয়ার সকল ভ্রান্ত মানবের মুক্তির উৎকণ্ঠায় বিভোর হয়ে থাকতেন। তিনি এত দয়ালু যে, নিজের পরম শত্রুদের সাথে গলাগলি এবং তাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছেন এবং সেজন্য নিজেও অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত করেছেন। যখন তিনি একজন বিজয়ী তখনও তিনি রাত্রি জাগরণকারী তপস্বী। যখন তাঁর আরব সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার সময়, তখন তিনি খেজুর গাছের ছাল ভরা বালিশে ভর দিয়ে খসখসে চাটাইয়ের ওপর উপবেশনকারী ফকিররূপে বিরাজমান। যখন সমগ্র আরব তাঁর করায়ত্তে তখন তাঁর ঘরে একটি পানির মশক, কয়েকটি কাঠের পাত্র ও কয়েক মুঠি যব মাত্র সম্বল। তাঁর এ জীবনধারা দেখে হযরত উমরও বিস্মিত হয়ে বলেন : 'কায়সার ও কিসরা দুনিয়ার মজা লুটছে, আর আপনি নবী হয়ে এত অভাব-অনটনের মধ্যে আছেন?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন : 'হে উমর! তুমি কি এতে রাজি নও যে, তারা দুনিয়ার অস্থায়ী সুখ উপভোগ করুক আর আমরা আখেরাতের অফুরন্ত চিরস্থায়ী সৌভাগ্য ও সম্মান লাভ করি?' (মাওলানা মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান নদভী প্রণীত, আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বনবীর বিপ্লবী জীবনী, ইনকিলাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪-১৭৫)

যা হোক মহানবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে। রাসূলের জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত আদর্শ জীবনের বর্ণনা সংক্ষেপে এখানে উপস্থাপন করা হলো।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মগ্রহণের পরপরই তাঁর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। যেমন যখন তিনি দুধ মায়ের দুধ পান করেছেন তখন একটি স্তন তাঁর দুধ ভাইয়ের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এটি অবশ্যই একটি অলৌকিক বিষয় এবং মহান আল্লাহর বিশেষ ইশারা। বালক বয়স থেকেই রাসূল (সা.)-এর কর্মকাণ্ড ছিল আদর্শ।

সবাই যখন এ বয়সে খেলাধুলায় লিপ্ত তখন তিনি অন্য চিন্তায় মশগুল। তাঁর আচরণ অন্য বালকদের মতো নয়। বালক বয়সেই বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র, দাস, ইয়াতীম সবার সাথে তাঁর আচরণের কারণে তিনি সকলের স্নেহভাজন হয়েছিলেন। সেই বয়সেই সত্যবাদিতার কারণে তিনি 'আস-সাদিক' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

যুবক বয়সে হিলফুল ফুযুলে যোগ দিয়ে তিনি সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর কারণে তিনি 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত হন। জাহেলিয়াতের যুগের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। কোনো অশ্লীলতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি কোনোদিন মূর্তির সামনে মাথা নত করেননি। উজ্জ্বল কর্মকাণ্ডের জন্য ইয়াতীম হয়েও তিনি সমাজের সকল শ্রেণির মধ্যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। হাজরে আসওয়াদ স্থাপনে তাঁর রায় সবাই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিল।

যুবক বয়সে তিনি বিয়ে করেন একজন বিধবা নারীকে। যখন নারীদের মানুষ বলে গণ্য করা হতো না, সে সময় তিনি নারী জাতির মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। নারীকে যথাযথ অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। পরিবারের মধ্যে রাসূল একজন আদর্শ স্বামী। স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধানে তিনি আদর্শ ছিলেন।

তিনি ছিলেন আদর্শ পিতা। যে সময় কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো সেসময় তিনি হযরত ফাতেমা (আ.)-এর প্রতি যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন তাতে সন্তান হিসেবে কন্যার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত ফাতিমার প্রতি আচরণের মাধ্যমে একজন কন্যার সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে রাসূলুল্লাহ (সা.) তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রতিবেশী হিসেবে রাসূল (সা.) ছিলেন অতুলনীয়। যে বৃদ্ধা তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো তার অসুস্থতায় তিনি তার শিয়রে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। প্রতিবেশীর আনন্দে অংশগ্রহণ করা, শোকে সান্ত্বনা দেয়া, বিপদে সাহায্য করা, অসুস্থতায় দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগহণ করাকে তিনি প্রতিবেশীর হক (অধিকার) বলে উল্লেখ করেছেন। প্রতিবেশী পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ দান, দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্য ধার চাইলে ধার দেয়া, ধার দিতে অক্ষম হলে সহানুভূতি প্রদর্শন করাকে তিনি প্রতিবেশীর কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি যেমন প্রতিবেশীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন তেমনি তাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি

বলেছেন : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَشْبَعُ وَ جَارُهُ جَائِعُ إِلَى جَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি তার নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে ভূখা রেখে নিজে পেট পুরে খায় সে মুমিন নয়।'

আবার তিনি তিনবার আল্লাহর কসম দিয়ে বলেছেন :

لَا يُؤْمِنُ الَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارٌ بِوَائِقِهِ

'যার দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশী শান্তি পায় না, সে মুমিন নয়।'

রাষ্ট্রীয় জীবনে রাসূল (সা.) তাওহীদী আদর্শের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করেন। দীর্ঘ ২৩ বছর সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি এমন আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সুষম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মজুরী প্রদানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন : 'মজুরের ঘাম শুকিয়ে যাবার আগেই তার পারিশ্রমিক মিটিয়ে দাও।'[৬] যাকাত, খুমসের বিধানের মাধ্যমে সমাজে ধনী-দরিদ্রদের সম্পদের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। সম্পদের অপব্যয়কে নিষিদ্ধ করেছেন। মজুতদারীর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

যুদ্ধের ময়দানে রাসূল একজন আদর্শ সেনাপতি। বিপক্ষ আক্রমণ না করা পর্যন্ত তিনি আক্রমণ করতেন না। সাধারণ নাগরিক, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ফসলের জমি, ফলবান বৃক্ষ, জীব-জন্তুর ওপর হামলা করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। সন্ধির ক্ষেত্রে রাসূল এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব। অপর পক্ষ সন্ধি ভঙ্গ না করলে তিনি সন্ধির শর্ত মেনে চলতেন।

মহানবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি পর্যায় যেমন আমাদের জন্য আদর্শ তেমনি তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী এবং প্রতিটি কর্মও আমাদের জন্য আদর্শ। তাঁর চলা, বলা, ওঠা, বসা, খাওয়া, শোয়া, শাসন, রাগ-অনুরাগ সবকিছুই এত আদর্শস্থানীয় যে, প্রতিটি মানুষকে তা আকৃষ্ট করে।

ইবাদাত-বন্দেগী : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইবাদাত-বন্দেগী সম্পর্কিত আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে যা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তবে ইসলামের প্রধান দু'টি রুকন নামায ও রোযার ব্যাপারে সামান্য ইঙ্গিত এখানে দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যধিক নামায পড়তেন। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দু'পা ফুলে যেতো। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেন : 'আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ ও নিশ্চয়তা দেয়ার পরও রাসূলুল্লাহ্ এত অধিক নামায পড়তেন যে, তিনি ক্লান্ত হয়ে

যেতেন।' তিনি নিয়মিত রোযা রাখতেন। তিনি রমযান মাসের রোযার আগে রজব ও শাবান এ দু'মাস একটানা রোযা রাখতেন।

জীবন যাপন প্রণালী : রাসূল (সা.) কখনই পেট পুরে খেতেন না। খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে তিনিই বলেছেন : মুমিনরা খায় একটি উদর পূর্ণ করে। আর কাফেররা খায় সাত উদরে। তিনি অযথা শরীরের কোনো অংশ বের করে রাখতেন না। তিনি কখনই নরম বিছানায় শুতেন না, চাটাইয়ের বিছানা ও ভেতরে খেজুরের ছাল দিয়ে চামড়ার বালিশ তৈরি করে ব্যবহার করতেন।

রাসূলের আচার-ব্যবহার : রাসূলুল্লাহ (সা.) ধীরে ধীরে থেমে থেমে কথা বলতেন যাতে সবাই বুঝতে পারে। যখন তিনি কথা বলতেন তখন তাঁর মধুর কণ্ঠ শুনে সকলে অভিভূত হয়ে যেত। যখন তিনি ভাষণ দিতেন তখন লোকজন অশ্রু সংবরণ করতে পারত না। কারো দিকে ফিরে কথা বললে যতক্ষণ সে মুখ ফিরিয়ে না নিত ততক্ষণ তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। পাশে তাকাবার সময় তিনি পুরো শরীর ঘুরিয়ে তাকাতেন। তাঁর সাথে যদি কেউ মুসাফাহা করতো তাহলে যতক্ষণ সে তার হাত টেনে না নিত তিনি তাঁর হাত টেনে নিতেন না। তিনি কখনই মুচকী হাসি ছাড়া হাসতেন না। দাসদাসীদের সাথে কোমল আচরণ করতেন। হযরত আনাস দশ বছর রাসূলের খেদমত করেছেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনোদিন কোনো বিষয়ে উহ্ পর্যন্তও বলেননি। কিংবা বলেননি যে, 'কেনো তুমি এরূপ করলে বা কেনো এরূপ করলে না।' তিনি সাহাবীদের সাথে সব রকম কাজে শরিক হতেন। এমনকি সবচেয়ে কঠিন কাজটি তিনিই বেছে নিতেন।

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পুরো জীবনটাই মানুষের জন্য আদর্শ। শুধু তত্ত্বগতভাবে নয়, বরং প্রতিটি কর্মের ক্ষেত্রে তিনি বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে। যদি আমরা তাঁর আদর্শ থেকে শিক্ষা না নিয়ে কেবল তাঁর আদর্শের প্রশংসা করি তাহলে আমাদের অবস্থা হবে ঐ সব অমুসলিম বিখ্যাত ব্যক্তির মতো যাঁরা শুধু তাঁদের কথায় বা লেখনীতে রাসূলকে আদর্শ বলেছেন, অথচ নিজেদের জীবনে তা মেনে চলার প্রয়োজন বোধ করেননি। আমাদের অবস্থা যেন তাঁদের মতো না হয় সে ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর কতিপয় বাণী ও সেগুলোর ব্যাখ্যা

সংকলন : এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর

বাণী নং ১

'দ্বন্দ্ব-সংঘাতের (বিশৃঙ্খলার) সময় দু'বছরের উষ্ট্র শাবকের মত হও, যার পৃষ্ঠ এমন নয় যাতে আরোহণ করা যায় এবং স্তনও এমন নয় যা দোহন করা যায়।'

ব্যাখ্যা : ইবনে আবিল হাদীদ এ বাণীর ব্যাখায় বলেছেন, এখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বলতে দু'জন বিপথগামী নেতার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ বুঝানো হয়েছে যারা উভয়ে বক্রপথের দিকে আহ্বান করে। উদাহরণস্বরূপ আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ, তেমনি জাহহাক ও মারওয়ান কিংবা হাজ্জাজ ইবনে ইফসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনে আশআস ইবনে কাইসের মধ্যকার যুদ্ধ। কিন্তু যখন দু'পক্ষের একটি সত্যপন্থী হবে তখন তাকে দ্বন্দ্ব বলা যায় না বরং সেক্ষেত্রে যে পক্ষ সত্য পথে রয়েছে তার পক্ষে অস্ত্র ধারণ ও যুদ্ধ করা (জিহাদ) ফরয অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা ও তার পতাকাকে উড্ডীন রাখতে প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন দিতে হবে। যেমন জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে ন্যায়কে সমর্থন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ ছিল।

ইবনে মাইসাম বাহরানী ফিতনা বা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময়ে করণীয় বিষয়কে দু'বছরের উষ্ট্র শাবকের সঙ্গে তুলনা করাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় পড়বে সে যেন সে অবস্থায় দুর্বল, অপরিচিত ও সম্পদহীন ব্যক্তির চেহারা ও রূপে আবির্ভূত হয় যাতে তাকে অত্যাচারীকে শারীরিক ও অর্থনৈতিক কোনভাবেই সহযোগিতা করতে না হয় ঠিক যেমনভাবে দু'বছরের উষ্ট্রশাবকের পৃষ্ঠ ও দুগ্ধ থেকে লাভবান হওয়া যায় না।

বাণী নং ১০

'মানুষের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ কর যেন (সেই অবস্থায়) তোমার মৃত্যুতে তারা ক্রন্দন করে এবং যদি জীবিত থাক তারা তোমার সাথে থাকতে ও মিশতে তীব্র আগ্রহ ব্যক্ত করে (তোমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হতে চায়)।'

ব্যাখ্যা : এ বাণীতে আলী (আ.) মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করা এবং লেন-দেনের ক্ষেত্রে তাদের সাথে নীতিগত সঠিক আচরণের উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার তাদেরকে সদাচারী ব্যক্তির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি উভয় অবস্থায় তার দিকে আকৃষ্ট করে।

বাণী নং ১৩

'যখন তুমি (আল্লাহর) নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করা শুরু কর তখন কম শোকর আদায় (কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে কার্পণ্যের মাধ্যমে) করে তা অব্যাহত থাকাকে দূরে সরিয়ে দিও না।'

ব্যাখ্যা : ইবনে মাইসাম বলেছেন : এ বাণীতে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, নিয়ামতকে অব্যাহত রাখতে শোকর আদায় করা অপরিহার্য। অধিক শোকর থেকে বিরত থাকা, যে নেয়ামত তার ভাগ্যে জুটেছিল তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের শামিল। মহান আল্লাহ নেয়ামত অব্যাহত থাকার জন্য তাঁর শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায়কে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং অস্বীকৃতিকে আযাবের কারণ বলেছেন : 'যদি তোমরা আমার নিয়ামতের (অনুগ্রহের) শোকর আদায় কর তোমাদেরকে (নিয়ামতের ক্ষেত্রে) বৃদ্ধি করব আর যদি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।'– সূরা ইবরাহীম : ৭

বাণী নং ১৫

'যে কেউ বালা মুসিবত বা পরীক্ষায় পড়লে তাকে তিরস্কার করা ঠিক নয়।'

ব্যাখ্যা : মানুষ কখনও তার ধর্মের ক্ষেত্রে পরীক্ষার সম্মুখীন হয় ও তার ওপর বিপদ-আপদ নেমে আসে। কখনও আবার পার্থিব কোন বিষয়ে সে বিপদগ্রস্ত হয়। কখনও

কখনও একই সঙ্গে উভয় ক্ষেত্রে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। কখনও মানুষ তার নিজের অজ্ঞতা (এই অজ্ঞতার বিষয়টি তার জ্ঞানে থাকুক বা না থাকুক অর্থাৎ সে যে এ বিষয়ে অজ্ঞ তা সে জানুক বা না জানুক) এবং কখনও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত বাহ্যিক কারণে বিপদের সম্মুখীন হয়। এদের মধ্যে শুধু ঐ সকল ব্যক্তি তিরস্কারের যোগ্য যারা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনার কারণ হয়েছে অর্থাৎ সে এ সমস্যায় পড়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বা আংশিক দায়ী।

যদি কেউ অজ্ঞতাবশত বিপদে পড়ে তবে তাকে তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করা উচিত নয়। কিন্তু যদি কেউ জ্ঞাতসারে এমন কিছু করে যে কারণে সে এরূপ সমস্যায় পড়েছে তবে সেই ব্যক্তির সমালোচিত ও তিরস্কৃত হওয়া উচিত। যেমন যদি কেউ জানা সত্ত্বেও অসৎ ব্যক্তিদের সংসর্গ ত্যাগ না করে এবং এ কারণে বিপদে পড়ে তবে অবশ্যই তিরস্কৃত হবে। এর বিপরীতে পূর্বোল্লেখিত ব্যক্তিকে যদি ঐ অবস্থায় তিরস্কার করা হয় তবে তাতে তার কোন লাভ তো হবেই না বরং তা করলে তার প্রতি যুলুম করা হবে। তাই যে ব্যক্তি বিপদে পড়ার ক্ষেত্রে নিজে দায়ী নয় তাকে সাহায্য করতে হবে এবং তার জন্য দোয়া করতে হবে।

ইবনে আবিল হাদীদ 'মাফতুন' শব্দের অর্থ প্রতারিত করেছেন। যদিও ইবনে মাইসাম শব্দটিকে বালা-মুসিবতে পতিত অর্থে ধরেছেন।

বাণী নং ১৬

'সকল বিষয় অদৃষ্টের এতটা নিয়ন্ত্রণাধীন যে, কখনো কখনো চেষ্টার ফলে মৃত্যু হয়।'

ব্যাখ্যা : ইবনে মাইসাম এ বাণীর ব্যাখায় বলেছেন : যেহেতু মানুষ অদৃষ্টের রহস্য সম্পর্কে অবগত নয় সেহেতু তার উচিত পরিণতির বিষয়টি অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে দেয়া এবং তার নিজের কাঙ্ক্ষিত পরিণতিকে অবধারিত জ্ঞান না করা। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ কোন কিছুতে কল্যাণ রয়েছে মনে করে সে লক্ষ্যে পৌঁছতে বিশেষ পরিকল্পনা করে, কিন্তু অবশেষে দেখতে পায় ঐ পরিকল্পনাই তার ধ্বংস ও পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইবনে আবিল হাদীদ এরূপ প্রচেষ্টার পরিণতির কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন আবু মুসলিম খোরাসানী বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে আব্বাসী বংশকে ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, কিন্তু সে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজের মৃত্যু ডেকে আনে।

ইবনে মাইসাম বলেছেন, উক্ত বাণীতে হযরত আলী (আ.) শুধু পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করতে নিষেধ করেছেন এবং পরিকল্পনার পর আল্লাহর ওপর নির্ভর করার ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন। অর্থাৎ নিজের চিন্তা ও পরিকল্পনার ওপর আস্থা যেন তাকে আল্লাহর নির্ধারিত সিদ্ধান্তের কথা ভুলিয়ে না দেয়।

বাণী নং ২১

'আমাদের অধিকার আছে যদি তা দেয়া হয়, তবে গ্রহণ করব– অন্যথায় আমরা উষ্ট্রসমূহের পিছনে আরোহণ করব যদিও রাতের ভ্রমণ দীর্ঘ হোক।'

ব্যাখ্যা : সাইয়্যেদ রাযি এ বাণী সম্পর্কে বলেছেন : এ বাক্যগুলো সূক্ষ্ম অর্থ বহন করে এবং অলংকারময় যা বাগ্মিতার পরিচয় বহন করে। এর বাণীর অর্থ আমাদের অধিকার না দেয়া হলে আমরা নত হয়ে থাকব অর্থাৎ উটের পেছনের আরোহীর ন্যায় যে বন্দী ও দাসের মত অবনত থাকে তার মত হব।

আজহারী আল কোতাইবী থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (আ.) উটের পিছনের আরোহীর উদাহরণ এজন্য দিয়েছেন যে, উষ্ট্রের পশ্চাদভাগে আরোহণ খুবই কষ্টকর একটি বিষয়। এরূপ উদাহরণ দিয়ে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, যদি তাঁদের অধিকার বঞ্চিত করা হয় তবে তাঁরা কষ্টকর বাহনে আরোহণ করবেন এবং ধৈর্য ধারণ করবেন যদিও তা দীর্ঘ সময়ের জন্য হয়। ধীর গতিতে কষ্ট সহ্য করে গন্তব্যে পৌঁছতে হলেও অধিকারের ব্যাপারে হাল ছাড়বেন না।

বাণী নং ২৪

'হে আদম সন্তান! যখন দেখবে তোমার মহাপবিত্র প্রতিপালক, তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামতকে অবিরতভাবে তোমাকে দিচ্ছেন অথচ তুমি তার নির্দেশকে অমান্য করছ (গুনাহে লিপ্ত রয়েছো) তখন তাঁকে ভয় কর।'

ব্যাখ্যা : এ বাণীতে হযরত আলী (আ.) আদম সন্তান অর্থাৎ মানবজাতিকে যখন তাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামত অব্যাহত রয়েছে তখন পাপ থেকে দূরে থাকা ও আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিয়েছেন। কেননা, যেমনভাবে আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় নিয়ামত অব্যাহত থাকার শর্ত তেমনি অকৃতজ্ঞতা যা ব্যক্তির গুনাহ ও নাফরমানীর মধ্যে প্রকাশ পায়, যার ফলে সে নিয়ামত লাভের উপযোগিতা হারায় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু তা-ই নয় বরং এর পরিণতিতে সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের সম্মুখীন হয় এবং তার ওপর তাঁর শাস্তি অবধারিত হয় যেমন পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : 'এবং যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও (তবে জেনে রাখ) নিশ্চয়ই আমার আযাব অত্যন্ত কঠোর।'– সূরা ইবরাহীম : ৭

তাই আল্লাহর ও মানুষের অধিকার হরণকারী কোন ব্যক্তির ওপর উপর্যুপরি নিয়ামত আসতে দেখে এটি তার জন্য কল্যাণকর মনে করা ঠিক নয় বরং এরূপ ব্যক্তির আল্লাহর শাস্তির ভয়ে শঙ্কিত ও সতর্ক হওয়া উচিত।

বাণী নং ২৯

'নিজেকে রক্ষা কর! নিজেকে রক্ষা কর! আল্লাহর শপথ, তিনি তোমাদের গুনাহকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছেন যেন তিনি তা ক্ষমা করেছেন।'

ব্যাখ্যা : ইবনে মাইসাম এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন : মানুষ তার পাপের কারণে অবশ্যই আল্লাহর ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। কেননা, তার এই অপরাধ ও পাপ ঢেকে রাখার বিষয়টি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং তার চিরস্থায়ী বিষয় নয়। তাই তাঁর ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গুনাহ থেকে নিবৃত্ত থাকা এবং তাঁর আনুগত্য করা বান্দার জন্য অপরিহার্য। তিনি তাঁর শাস্তিকে ত্বরান্বিত না করে সুযোগ দিয়েছেন ও তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে বান্দার পাপকে ঢেকে রেখেছেন এজন্য যে, বান্দা তাঁর অনুগ্রহকে স্মরণ করে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন ও তওবা করবে।

বাণী নং ৩৭

ইমাম আলী (আ.) তাঁর পুত্র হাসান (আ.)-কে বলেন : 'হে আমার পুত্র, (প্রথমে) চারটি এবং (পরে) চারটি বিষয় আমার কাছ থেকে সংরক্ষণ কর (সব সময় স্মরণ

রাখ)। এতে তুমি তার সঙ্গে যা কিছুই কর কখনই তোমার ক্ষতি হবে না। বিষয়গুলো হলো : নিশ্চয় সবচেয়ে বড় অমুখাপেক্ষিতা (মূলধন) হলো বুদ্ধিমত্তা; সবচেয়ে বড় নিঃস্বতা হলো মূর্খতা, সবচেয়ে বড় ভয় ও একাকিত্ব হলো আত্মঅহমিকা এবং সবচেয়ে সম্মানজনক পরিচয় হলো সুন্দর চরিত্র ও ব্যবহার।

হে আমার পুত্র, মূর্খ লোকের বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাক। কারণ, সে তোমার উপকার করতে গিয়ে অপকার করে ফেলবে। কৃপণ ব্যক্তির সঙ্গেও বন্ধুত্ব করো না। কারণ, যখন তোমার তার সাহায্যের তীব্র প্রয়োজন পড়বে সে তোমাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে। পাপী (লম্পট ও প্রতারক) ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব (সম্পর্ক) করো না। কারণ, সে তোমাকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে দেবে। মিথ্যাবাদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না। কারণ, সে মরীচিকার মত। তাই দূরের জিনিসকে সে তোমার জন্য কাছের (ও সহজলভ্য) এবং কাছের জিনিসকে দূরের (ও দুর্লভ্য) হিসেবে তুলে ধরবে।'

ব্যাখ্যা : ইবনে মাইসাম বলেছেন : আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) প্রথম যে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তা ব্যক্তির নিজের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ তার সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় চারটি বিষয় অন্য ব্যক্তির সাথে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিষয়।

প্রথম চারটি বিষয়ের প্রথম হলো বুদ্ধিবৃত্তি। বুদ্ধিবৃত্তি বলতে এখানে চিন্তাশক্তি বুঝানো হচ্ছে যার মাধ্যমে মানুষ স্বতঃসিদ্ধ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। বুদ্ধিবৃত্তিকে সবচেয়ে বড় অমুখাপেক্ষিতা বলা হয়েছে এজন্য যে, এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই অর্জন করা যায়। যদি ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তার অধিকারী না হয় তবে সে যত সম্পদের অধিকারী হোক না কেন সঠিকভাবে তা ব্যবহার করতে পারে না। তাই বুদ্ধি অমুখাপেক্ষিতার সবচেয়ে বড় উপকরণ।

দ্বিতীয়টি হলো মূর্খতা অর্থাৎ বুদ্ধির অনুপস্থিতি যা নেতিবাচক একটি বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়টিকে সবচেয়ে বড় নিঃস্বতা এজন্য বলা হয়েছে যে, মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মানুষ উন্নত নৈতিক গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হয় না এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হলো সর্বোত্তম নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়া।

তৃতীয় বিষয় হলো আত্মগর্ব ও অহমিকা যা বিনয়ের বিপরীত বৈশিষ্ট্য। একে সবচেয়ে বড় ভয় ও একাকীত্ব বলা হয়েছে। কারণ, আত্মগর্ব ব্যক্তিকে অন্যদের থেকে দূরে

সরিয়ে রাখে যা তাঁকে নিঃসঙ্গতার দিকে ঠেলে দেয়। এই নিঃসঙ্গতাই তার মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করে। এর বিপরীতে বিনয় মানুষকে বিনয়ী ব্যক্তির দিকে আকৃষ্ট করে।

চতুর্থ বিষয় হলো সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার। তা ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক পরিচয় হওয়ার কারণ হলো সুন্দর চরিত্র ও স্বভাব মানুষের আত্মিক পূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলী (আ.) চারটি বিষয় (চার ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব) পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন। যথা :

১. মূর্খ ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব পরিহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, সে তার মূর্খতার কারণে উপকারের স্থানে অপকার করে বসবে।

২. কৃপণ ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগ করতে বলেছেন। কারণ, তার কৃপণতা তার বন্ধুর তীব্র প্রয়োজনেও তার সাহায্য করা থেকে বিরত রাখবে।

৩. পাপী ও অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তার মধ্যে বিদ্যমান অনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করে। ফলে সে দুনিয়াবী লাভের জন্য তাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

৪. মিথ্যাবাদী বন্ধুকে মরীচিকার সাথে তুলনা করেছেন এবং এমন ব্যক্তির সংশ্রব ত্যাগ করতে বলেছেন। এমন ব্যক্তিকে মরীচিকার সঙ্গে তুলনা করার কারণ হলো মরীচিকাকে যেমন মানুষ তার অতি নিকটে রয়েছে মনে করে, তাকে সহজপ্রাপ্য জ্ঞান করে অথচ বাস্তবে তেমন নয় তেমনি মিথ্যাবাদী যাকে সহজলভ্য বলে তুলে ধরে বাস্তবে তা অর্জন দুঃসাধ্য ও অসম্ভব। কখনও কখনও সে সহজলভ্য বিষয়কে দুষ্প্রাপ্য হিসেবে উপস্থাপন করে যা বাস্তবের বিপরীত যেমন মরীচিকাকে মানুষ পানি মনে করে তার দিকে ধাবিত হয়ে দেখে বাস্তবে তেমনটি নয়।

বাণী নং ৩৮

‘নফল ইবাদত করতে গিয়ে যদি ফরয ইবাদতের ব্যাঘাত ঘটে তবে তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য পাওয়া যায় না।’

নফল ইবাদতের মাধ্যমে ফরয ইবাদতের ব্যাঘাত কয়েকভাবে ঘটতে পারে। কখনও নফল ইবাদত করতে গিয়ে ফরয ইবাদত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন রাত জেগে ইবাদত করতে গিয়ে ফজরের নামায কাযা হয়ে যাওয়া, কখনও একটি মুস্তাহাব অংশ আদায় করতে যাওয়ার কারণে ফরয ইবাদতের কোন অপরিহার্য অংশ (রুকন) পালন করতে না পারা ইত্যাদি। উভয় ক্ষেত্রে যেহেতু ফরয ইবাদত ক্ষতিগ্রস্ত হয় (সম্পূর্ণ হাত ছাড়া হওয়া বা অপরিহার্য অংশ বাদ পড়ার মাধ্যমে) সেহেতু তা গুনাহ্‌র শামিল এবং যে কর্ম আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফরয কাজের অন্তরায় হয় তার মাধ্যমে কখনও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায় না।

বাণী নং ৪০

হযরত আলী (আ.) তাঁর এক সহচরের অসুস্থতার সময় বলেন : 'আল্লাহ্‌ তোমার রোগকে পাপ খণ্ডনের উপায় করে দিন। কারণ, অসুস্থতার কোন পুরস্কার নেই। কিন্তু তা তোমার পাপকে মোচন করে এবং তা শুকনো পাতার মতো ঝরিয়ে দেয়। পুরস্কার শুধু মুখের কথা এবং হাত ও পায়ের (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) দ্বারা সম্পাদিত কর্মে। মহান আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে হৃদয়ের নিয়তের সততা এবং আত্মিক পবিত্রতার অধিকারীদের যাকে ইচ্ছা বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।'

ইবনে মাইসাম বলেন : ইমাম আলী (আ.) অসুস্থতার কারণে ঐ ব্যক্তির পাপ মোচনের জন্য দোয়া করেছেন, তার জন্য পুরস্কার ও সওয়াবের দোয়া করেননি এবং তার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, অসুস্থতার জন্য কোন পুরস্কার নেই।

মানুষ তার কর্মের মাধ্যমে সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হয় নতুবা যে কর্ম করতে তাকে নিষেধ করা হয় তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। কিন্তু অসুস্থতা এ দুটির কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু অসুস্থতা মানুষের পাপ মোচনের উপকরণ দু'ভাবে হতে পারে :

১. যেহেতু মানুষ জৈবিক প্রবৃত্তি ও ক্রোধের বশবর্তী হয়েই গুণাহ্‌য় নিপতিত হয়, অসুস্থতা এ প্রবৃত্তির উপশম ঘটিয়ে অপরাধ ও অন্যায়ের প্রবণতার হ্রাস ঘটায়।

২. অসুস্থতা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং তাকে তার গুনাহ্‌র জন্য অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে তাতে পতিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ ও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত করে। যেমন পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন : 'যখন দুঃখ-কষ্ট মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে শায়িত, বসা ও দণ্ডায়মান অবস্থায় আমাদেরকে ডাকে।'– সূরা ইউনূস : ১২

তাই গুনাহ্‌র কারণে মানুষের মধ্যে যে কলুষের সৃষ্টি হয় অসুস্থতার সময় আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে সে তা থেকে মুক্তি লাভ করে। শুকনো পাতা যেমন গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি অসুস্থতার সময় গুণাহ পাপী ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন ও দূরীভূত হয়।

অবশেষে হযরত আলী (আ.) এ বিষয়ের প্রতি ইশারা করেছেন যে, যখন অসুস্থ ব্যক্তি তার ওপর আপতিত কষ্টকে মেনে নিয়ে পবিত্র আত্মা নিয়ে সৎ নিয়তে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাতে ধৈর্য ধারণ করে তখন তার এ কর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের উপযোগিতা লাভ করে এবং তার বেহেশতে প্রবেশের কারণ হয়। কারণ, তার এ কর্ম ঐ সকল স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়েছে।

বাণী নং ৪৩

'যে মন্দ কাজ (তুমি তা করার পর) তোমাকে দুঃখিত করে তা আল্লাহ্‌র নিকট তোমার ঐ সৎকর্ম থেকে উত্তম যা তোমাকে গর্বিত করে।'

এ বাণীতে 'যে মন্দ কাজ তোমাকে দুঃখিত করে' বলতে যে পাপ কর্ম মানুষের দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার পর তাকে অনুশোচিত করে ও তার মনঃকষ্টের কারণ হয় তা বুঝানো হয়েছে এবং 'যে সৎকর্ম তোমাকে গর্বিত করে' বলতে ঐ সকল সৎকর্মের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যা তার মধ্যে অহংকারের জন্ম দেয় এবং ফলে সে নিজেকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ ভাবে। আল্লাহ্‌র নিকট এমন সৎকর্ম অপেক্ষা যে মন্দ কর্ম ব্যক্তিকে মনঃপীড়ায় দগ্ধ করে তা উত্তম বলে পরিগণিত। কারণ, মানুষ যদি মন্দ কর্ম করার পর অনুশোচিত হয় তবে তা ঐ মন্দ কর্মকে মুছে ফেলে, কিন্তু মানুষ সৎ কর্ম করার পর তা নিয়ে গর্বিত হলে তা ঐ সৎকর্ম বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি

আত্মগর্ব অন্যতম নিন্দনীয় মন্দ বৈশিষ্ট্য যা অন্তরকে কলুষ করে। যেহেতু এরূপ কর্মের মন্দ প্রভাব অত্যন্ত বেশি সেহেতু আল্লাহ্‌র নিকট তা বেশি অপছন্দনীয়।

বাণী নং ৪৬

'সম্মানী লোক যখন ক্ষুধার্ত হয় এবং হীন লোকের যখন উদর পূর্ণ থাকে (তখন) তাদের আক্রমণকে ভয় কর।'

ইবনে মাইসাম বলেন, 'সম্মানী লোক' বলতে উৎকৃষ্ট চিন্তার অধিকারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে এবং 'ক্ষুধার্ত হওয়া' অর্থ সে যখন তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। এ অবস্থায় যদি মানুষ তার প্রতি দৃষ্টি না দেয় তবে তার মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধের সৃষ্টি হয়। তখন সে তার উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য নিজেকে হুমকির মধ্যে ফেলতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সে যদি তার বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে তাদের ওপর কর্তৃত্ব লাভে সক্ষম হয় তবে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। তাই তার প্রয়োজনের সময় সকলের তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক।

'হীন লোকের যখন উদর পূর্ণ থাকে' বলতে তার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও সম্পদশালী অবস্থা বুঝানো হয়েছে। যদি সে এ অবস্থায় পৌঁছায় তবে সে তার হীন ইচ্ছাকে কার্যকর করতে সকল ধরনের পদক্ষেপ নেয়। তখন যারা তার অধীনে থাকে অথবা তার প্রতি মুখাপেক্ষী তাদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়। এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও উচিত সে যেন এরূপ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করতে না পারে তার জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বাণী নং ৫২

'ধৈর্য দু'ধরনের। যা তুমি অপছন্দ কর সে বিষয়ে ধৈর্য এবং যা তুমি পছন্দ কর সে বিষয়ে ধৈর্য।'

ব্যাখ্যা : প্রথম ধরণের ধৈর্য হলো প্রতিকূলতার মোকাবেলায় দৃঢ়তা দেখানো যার নমুনা হলো যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতা প্রদর্শন এবং দ্বিতীয় ধরণের ধৈর্য হলো ব্যক্তি যা পছন্দ করে ও চায় তা আল্লাহ্‌র নিষেধের কারণে বর্জন করা। চারিত্রিক ও নৈতিক সকল ক্ষেত্রে আত্মসংযম হলো এ ধৈর্যের নমুনা।

বাণী নং ৫৭

'জিহবা হিংস্র পশুর ন্যায়। যদি তাকে ছেড়ে দাও দংশন করবে।'

ব্যাখ্যা : যদি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে না রাখে তবে তা হিংস্র প্রাণীর ন্যায় যাকে পায় তাকে দংশন করবে অর্থাৎ মিথ্যা, পরনিন্দা চর্চা, অপবাদ আরোপ ও কু বাক্যের মাধ্যমে অন্যের সম্মানহানি ঘটাবে। এমনকি স্বয়ং জিহ্বার অধিকারীকেও অসম্মানিত করে ছাড়বে।

বাণী নং ৬৩

'অপাত্রে কোন কিছু চাওয়া অপক্ষো প্রয়োজন পূরণ না হওয়া সহজতর (উত্তম)।'

ব্যাখ্যা : অপাত্র বলতে হীন চরিত্র ও নীতিহীন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। প্রয়োজন পূরণ না হওয়াকে এজন্য সহজ বলা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে মানুষ শুধু একটি কষ্ট পায় আর তা হলো তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়া। কিন্তু অপাত্রে চাওয়া হলে সাধারণত তা লাভ করা যায় না। ফলে অপমানিত হতে হয়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে না পাওয়ার ও বঞ্চিত থাকার সঙ্গে আরেকটি কষ্ট যোগ হয় তা হলো অপমানের কষ্ট। তাই হীন ব্যক্তির নিকট চাওয়ার কষ্ট অধিক। এ বাণী থেকে এটাও বোঝা যায় যে, মানুষ যে ক্ষেত্রে এমন কিছুর মুখাপেক্ষী হয় যা হাতে পাওয়া সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে অন্যের নিকট চাওয়ার চেয়ে আত্মসংযমের পথ অবলম্বন করা উচিত।

বাণী নং ৬৪

'সামান্য হলেও দান করতে লজ্জাবোধ করো না। কারণ, আদৌ কিছু না দেয়া তার থেকেও স্বল্প।'

ব্যাখ্যা : ইবনে মাইসাম এ বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্বল্প বলতে এ বাণীতে নগণ্য বোঝানো হয়েছে। অবশ্য আদৌ কিছু না দেয়া শূন্যের ন্যায়। তাই তা পরিমাণের দৃষ্টিতে স্বল্প বা নগণ্য কিংবা তার বিপরীতে অধিক বা বেশি হওয়া কোনটির সঙ্গেই তুলনীয় নয়। তাই এখানে দাতার সাধ্য অনুযায়ী দানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লজ্জার খাতিরে স্পল্প দান থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন।

(নাহজুল বালাগা থেকে)

ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন

বিশ্বদৃষ্টি ও ধর্ম

কোরআনের ঐশী স্বরূপ

মানবতাবাদ

মহান আল্লাহর ন্যায়বিচার

বিশ্বদৃষ্টি ও ধর্ম

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্যের জন্য মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব তা হলো তার বিবেক-বুদ্ধি। মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিবেক মানুষকে তার নিজ অস্তিত্ব নিয়ে, অন্যান্য সৃষ্টি নিয়ে, স্রষ্টা নিয়ে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের দেহ যেমন খাদ্য কামনা করে তেমনি তার আত্মাও খাদ্য খুঁজে ফেরে যার নাম হলো ধর্মবিশ্বাস যা অব্যাহতভাবে তাকে নিজ স্রষ্টা সম্পর্কে সচেতন করতে চায়।

ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনার শুরুতে প্রাসঙ্গিকভাবেই বিশ্বদৃষ্টি ও মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বিশ্বদৃষ্টি : নিখিল বিশ্ব, মানুষ ও সমাজ সম্পর্কিত অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অস্তিত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ও এতৎসংক্রান্ত যে বিশ্বাস তাকে বিশ্বদৃষ্টি বলে। যেমন বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি : বিশ্বের কোন স্রষ্টা আছে কি, বিশ্বের নিয়ম কিরূপ, এর ভবিষ্যৎ গতি কোন্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসরমান, এর আদৌ কোন লক্ষ্য আছে কি? আবার মানুষ সর্ম্পকে দৃষ্টিভঙ্গি : মানুষের প্রকৃতি কিরূপ, সে কি বিশেষ প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে নাকি তার কোন প্রকৃতিই নেই, পারিপার্শ্বিকতাই এর প্রকৃতি নির্ধারণ করে; সে কি স্বাধীন প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছে, না বাধ্য; সে কি মনোনীত কোন সৃষ্টি, না দুর্ঘটনার ফলশ্রুতি ইত্যাদি।

বিশ্বদৃষ্টিকে ভূয়োদর্শন, বিশ্বদর্শন ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসগত বিষয় বিশ্বদৃষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়।

মতাদর্শ : মতাদর্শ বলতে মানুষের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে এক শ্রেণির সামগ্রিক মতামতকে বুঝায়।

পৃথিবীতে দু'ধরনের বিশ্বদৃষ্টি বিদ্যমান :

১. **বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি :** অতি প্রাকৃতিক বিষয়াদি বিশ্বাস করে না। বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তিদের অভিমত হলো এ পৃথিবীর কোন স্রষ্টা নেই।

২. **আধ্যাত্মিক বা ভাববাদী বিশ্বদৃষ্টি :** অতি প্রাকৃতিক ও অবস্তুগত বিষয় বিশ্বাস করে। আধ্যাত্মিক বিশ্বদৃষ্টি সকল কিছুর অস্তিত্বের পেছনে একজন জ্ঞানী স্রষ্টার স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আধ্যাত্মিক বিশ্বদৃষ্টির অভিমত হলো সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টিকে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করা ও এগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার দ্বারা জ্ঞানী স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আধ্যাত্মিক বিশ্বদৃষ্টিকে ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টিও বলা যায়।

বস্তুবাদী ও আধ্যাত্মিক বিশ্বদৃষ্টির মধ্যে সংক্ষিপ্ত তুলনা

অভিমত হলো এ পৃথিবীর কোন স্রষ্টা নেই। আদি বস্তু হতে সব কিছুর সৃষ্টি। আদি বস্তুতে আকস্মিক এক বিস্ফোরণের ফলেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নিউটনের প্রথম সূত্র অনুযায়ী যে বস্তু স্থির রয়েছে তাতে বল প্রয়োগ না করলে তা অনন্তকাল ঐ জায়গাতেই অবস্থান করবে। আর কোন গতিশীল বস্তুকে বল প্রয়োগ না করলে তা অনন্তকাল গতিশীল থাকবে।

প্রশ্ন হলো আদি বস্তুটি ছিল স্থির, তাহলে এতে বিস্ফোরণ ঘটলো কিভাবে? আমরা জানি, কারণ ছাড়া ফলাফল অর্জিত হয় না। আর তাই বস্তুবাদীরা কারণকে মেনে নিয়ে বলেছে যে, এর পেছনে কারণ রয়েছে, তবে তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

যদি ধরে নেয়া হয় যে, অজ্ঞাত কারণে এক মহাবিস্ফোরণের ফলে সমস্ত সৃষ্টির অস্তিত্ব, কিন্তু বিস্ফোরণের যে ফলাফল আমরা দেখতে পাই তাতে কি এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না যে, আকস্মিক এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে কি এত সুসামঞ্জস্যশীল সৃষ্টি সম্ভব? মহাশূন্যে ভাসমান নক্ষত্ররাজির পরিক্রমণ, হাজার হাজার প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনচক্র কিংবা শুধু মানুষের শারীরিক গঠনতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় যে, এর পেছনে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া এ ধরনের সৃষ্টি কখনই সম্ভব নয়। এভাবে আরো দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়। তবে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বস্তুবাদীদের অভিমত মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই এ সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত আলোচনা না করে বিবেক-বুদ্ধির যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য আধ্যাত্মিক বিশ্বদৃষ্টির বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ধর্ম : ধর্মের আভিধানিক অর্থ হলো আনুগত্য ও পুরস্কার-প্রতিদান। আর এর পারিভাষিক অর্থ হলো বিশ্বজগৎ ও মানব জাতির সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল ব্যবহারিক বিধি-বিধানে বিশ্বাস।

ধর্মের পাশ্চাত্য প্রদত্ত সংজ্ঞা : ধর্ম হচ্ছে মানুষ ও তার প্রভুর মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এটি আসলে বস্তুবাদী চিন্তাধারা থেকেই উৎসারিত। যদি ধর্মকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহলে বস্তুগত কামনা-বাসনার অনেক কিছুই পরিত্যাগ করতে হবে, শোষণ-নির্যাতনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে, অনেক রকমের দায়িত্বের ভার কাঁধে অর্পিত হবে। এ সব কারণে পাশ্চাত্য ধর্মকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে।

ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা : প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বলতে স্রষ্টার সাথে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কই শুধু বোঝায় না; বরং এক মানুষের সাথে অন্য মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে নিখিল বিশ্বের সম্পর্কও বোঝায়।

ধর্মের উৎপত্তি

এ কথা সত্য যে, প্রাগৈতিহাসিক পর্যায় থেকে অতি আধুনিককাল পর্যন্ত চিরদিনই ধর্মবিশ্বাস মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিরাজ করেছে। অতীত কিংবা বর্তমান কোন যুগেই এমন কোন সমাজ দেখা যায় না যেখানে ধর্ম সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি।

গবেষকবৃন্দ মানুষের জীবনে ধর্মের উৎপত্তি ও এর উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের এ গবেষণা একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। ফলে তাঁদের সিদ্ধান্তগুলোও ঐ সব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে বস্তুবাদীদের অভিমত : বস্তুবাদীদের মতে ধর্ম হলো মানুষের সৃষ্টি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইত্যাদি নানা কারণে অপরাপর মানুষকে বঞ্চিত করার জন্যই মানুষ ধর্মকে সৃষ্টি করেছে।

দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন : 'আমার ধারণা ধর্ম প্রতিষ্ঠার কারণ, সর্বোপরি, ভীতি : অজানার ভীতি, মৃত্যুভীতি, পরাজয়ের ভীতি, গোপন ও রহস্যময়ের ভীতি। তদুপরি যেমন ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যাতে মনে এমন ভাব জাগে যে, সবাই

কল্পনা করতে পারে সব রকম বিপদ-আপদে ও সংগ্রামে একজন রক্ষাকারী তার পক্ষে আছে।'– Russel, Why I am not a christian, p. 37

সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসের আদি ও মৌলিক প্রেরণা হলো ভীতি– এটা যদি আমরা মেনেও নিই তাহলেও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কাল্পনিক হয়ে যায় না। যদি ভীতিতাড়িত হয়েই মানুষ এ থেকে পরিত্রাণের জন্য আশ্রয় খুঁজে থাকে এবং এভাবে সত্যকে খুঁজে পায় তাহলেই বা অসুবিধা কোথায়?

এটা মনে করা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হবে যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন সত্যতা নেই, কারণ তা মানুষ আবিষ্কার করেছে এবং রোগ এবং মৃত্যুর ভীতিবশত একে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু বাস্তব হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান সত্য, মানুষ রোগের ভীতি বা মৃত্যুর ভীতি বা অন্য যে কোন কারণেই তা খুঁজে বের করুক না কেন।

এটা ঠিক যে, মানব জীবনের একেবারে আদিম পর্যায়ে মানুষ ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারীর মতো বিষয়গুলো দ্বারা ভীতির শিকারে পরিণত হয়েছে এবং এসবের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রামে সে অবলম্বন খুঁজেছে। অবশেষে চেষ্টা-সাধনার দ্বারা ভীতিকে জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

আদিম মানুষের চিন্তা ভীতি দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল– এটা আবিষ্কারের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ হয় না যে, ধর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহের একমাত্র মূল কারণ ভীতি এবং অজ্ঞতা। কারণ, মানব জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়সহ সমগ্র ইতিহাস অনুসন্ধান ব্যতিরেকে ইতিহাসের মাত্র একটি অংশ থেকে এ উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে শত শত চিন্তাবিদের ধর্মবিশ্বাস কি ঝড়, ভূমিকম্প আর রোগ সংক্রান্ত ভীতির ফল? যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ ও গবেষণার ফলে প্রাপ্ত তাঁদের ধর্মপ্রিয়তাকে কি তাঁদের অজ্ঞতা কিংবা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত বলে অভিহিত করা যায়? তাই মানবীয় আচরণের একটি বিশেষ ও সীমিত পর্যায়ে ভীতি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তার ওপর ভিত্তি করে সকল যুগকে বিচার করা যায় না।

অনেকে রয়েছেন যাঁরা ধর্মবিশ্বাসকে অর্থনৈতিক কারণের সাথে যুক্ত করে থাকেন। তাঁদের মতে ধর্ম সবসময়ই শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের সেবায় লিপ্ত; ধর্ম শোষিত জনগণের প্রতিরোধ স্তব্ধ করার জন্য শোষকশ্রেণি কর্তৃক আবিষ্কৃত হাতিয়ার। তাঁরা

বলেন, ধর্ম বঞ্চিত শ্রমজীবীদের ধোঁকা দেয়া এবং তাদের বঞ্চনাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। এতে সন্দেহ নেই যে, দুনিয়ার আর সব জিনিসের মতো ধর্মকে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার মাধ্যমে এর অপব্যবহার সম্ভব। কিন্তু ধর্ম ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে অপরিহার্য দাবী করে ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা অযৌক্তিক।

কখনও কখনও দেখা যায়, কোন সমাজ উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, আবার তারা ধর্মের সাথেও নিবিড়ভাবে যুক্ত, আবার কোন সমাজ একই রকম আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করেও সম্পূর্ণ ধর্মবিমুখ। একইভাবে কোন সমাজে হয়তো দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার সাথে সাথে ধর্মও অস্তাচলে গেছে। আবার হয়তো অনুরূপ কোন অবনতিশীল সমাজেই ধর্মের প্রভাব সর্বোচ্চ পর্যায়ে। তাই বলা যায়, এ দু'টি বিষয় একত্রে বিরাজ করলেও এদের মধ্যে কার্যকারণগত সম্পর্কের পর্যাপ্ত উপাদান নেই।

বহু ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ধর্মই সমস্ত সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কোন বস্তুগত লাভের আশা ছাড়াই ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের ত্যাগ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যেমন ফিরআউন যাদুকরদের একত্রিত করেছিল হযরত মূসা (আ.)-এর উপর বিজয় লাভ করার জন্য। কিন্তু যখন তাঁরা মূসা (আ.)-এর সাথে মোকাবিলায় পরাজিত হন, তখন তাঁরা আলাহ্‌র ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন। ফিরআউন তাঁদেরকে অঙ্গচ্ছেদ করে হত্যার হুমকি প্রদান করে, কিন্তু তাঁরা ফিরআউনের হুমকিতেও অবিচল থাকেন। তাঁরা ফিরআউনকে জানিয়ে দেন :

قَالُوا۟ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿٧٢﴾

'আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ওপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এ পার্থিব জীবনেই যা করতে পার।'–সূরা ত্বাহা : ৭২

তাই ধর্মের প্রতি মানুষের বিশেষ টানকে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানো যাবে না।

এ কথা সত্য যে, কোন কোন ধর্ম ওহীর সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কারণে, উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তথাপি বস্তুগত বা অর্থনৈতিক চাহিদা কিংবা প্রকৃতির রুদ্র শক্তির প্রতি ভীতি, অজ্ঞতা বা বিজ্ঞান কর্তৃক

বিবর্জিত কোন বিষয়কে সকল ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎস হিসাবে আখ্যায়িত করা অযৌক্তিক।

কতিপয় ধর্মের অনুসারীদের প্রদত্ত ভ্রান্ত শিক্ষা, অপর্যাপ্ততা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ভ্রষ্টতা নিঃসন্দেহে ধর্মবিরোধী চিন্তা ও নাস্তিকদের উদ্ভবের অন্যতম কারণ। সুতরাং কোন্ ধর্মের আনুগত্য মানুষ কেন করে এসেছে তার কারণ গবেষণা করার সময় প্রতিটি ধর্মের বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা করে আলোচনা করতে হবে।

আর যে কোন বিষয়ে চেষ্টা-সাধনা করার চেয়ে সমগ্র জগতের অস্তিত্বের মূল স্বরূপ জগতোত্তীর্ণ এক সত্তার ধারণা লাভ অনেক বেশি দুরূহ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে সূর্য মানুষের কাছে সবচেয়ে দৃষ্টিগোচর তার প্রকৃত রহস্যই অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। সূর্যের গতিপ্রকৃতি ও প্রভাবকে নানাভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। সূর্যরশ্মির আলোকোজ্জ্বলতাকে কেউই অস্বীকার করতে পারে নি; তবু সূর্য সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই রয়ে গেছে অজ্ঞতার অন্ধকারে।

সুতরাং যুক্তিপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশেষণ ও ব্যাপক গবেষণা ছাড়া মহান সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। তাই চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাদ্ধতার কারণে যদি কুসংস্কার এবং ধর্মীয় কিংবদন্তী নতুন রূপ ধারণ করে মানব মনে স্থান করে নেয় তার অর্থ এটা নয় যে, ধর্ম তার মৌল নীতিসহ নিজেই একটি ভ্রান্ত ব্যাপার। বরং এর মাধ্যমে মনের গভীরে ধর্মীয় আকুতির প্রাবল্য ও স্বাতন্ত্র্যই প্রকাশিত হয়।

ইসলামী উৎসের ভিত্তিতে বলা যায় যে, মানুষের আবির্ভাবের সাথে সাথেই ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং মানব জাতির প্রথম সদস্য হযরত আদম (আ.) স্বয়ং আল্লাহ্র নবী ছিলেন। তাঁর ওপর নাযিলকৃত ধর্ম খুবই সহজ-সরল ছিল এবং তা মাত্র কয়েকটি বিধানের সমষ্টি ছিল। যেমন মহান আলাহকে স্মরণ করা, অন্যের প্রতি, বিশেষ করে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, ফিতনা-ফ্যাসাদ, হত্যা এবং যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

আর অংশীবাদী ধর্মসমূহ সর্বদা বিচ্যুতি এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত লোভ-লালসার ফলে উৎপত্তি লাভ করেছিল।

যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন তারা ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা শুরু করে। মানুষ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রতিটি গোত্রেই এমন কতিপয়

ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল যাদেরকে সবাই খুব সম্মান করত। এমনকি তাদের মৃত্যুর পর মানুষ তাদের মূর্তি তৈরি করে এবং এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের প্রশংসা করতে শুরু করে। এভাবে মানুষের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়।

ধর্ম শিক্ষা করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বস্তুবাদীদের অভিমত হলো ধর্ম শিক্ষা বা ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করা হলো বৃথা সময় নষ্ট করা। স্রষ্টার ধারণা, ধর্ম– এগুলো মানুষের সৃষ্টি। আদিম যুগের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন ঝড়, বন্যা, খড়া, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, অগ্নুৎপাত, দাবানল, মহামারী প্রভৃতির কারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল এবং এগুলোকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার ছিল না। এ অজ্ঞতা ও অক্ষমতার কারণে মানুষ এক মহাশক্তির কল্পনা করতে থাকে যিনি তাদেরকে এগুলো থেকে রক্ষা করতে পারবেন। আর এভাবেই সৃষ্টিকর্তার ধারণার উদ্ভব হয়। এরপর সৃষ্টিকর্তার জন্য উপাসনার পদ্ধতি তথা ধর্মের উদ্ভব হয়। সুতরাং স্রষ্টা এবং ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা একটি অর্থহীন কাজ এবং এ সম্পর্কিত আলোচনা সময়ের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিচে ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনার সপক্ষে কিছু যুক্তি উপস্থাপন করা হলো যার মাধ্যমে বস্তুবাদীদের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করার পাশাপাশি প্রকৃত ধর্ম শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বও স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. কুসংস্কার হতে মুক্তি : ধর্ম মানুষের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে বিপব সাধন করে মানুষকে কুসংস্কার হতে মুক্তি দান করে। এক্ষেত্রে আমরা বস্তুবাদীদের জগৎ সৃষ্টির বিষয়টিকে বিবেচনায় আনতে পারি। তাদের মতে আদি বস্তু হতে সকল বস্তুর সৃষ্টি। প্রাণহীন বস্তু হতে প্রাণের সৃষ্টি, শক্তিহীন হতে শক্তির সৃষ্টি, জ্ঞানহীন হতে জ্ঞানের সৃষ্টিতে যদি কেউ বিশ্বাসী হয়, তাহলে বলা যায় সে-ই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি। এর বিপরীতে ধর্ম এটা শিক্ষা দেয় যে, এক জীবন্ত এবং জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ও সর্বশক্তির অধিকারী সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন। এভাবে ধর্ম মানুষকে কুসংস্কার হতে মুক্ত করে।

২. চরিত্র ও নীতির বিকাশ : ধর্মীয় আলোচনা মানুষকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলে। বস্তুবাদীরা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাই এ পার্থিব জীবনেই সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে ওঠে। সে একজন স্বার্থপর ও বিলাসী

ব্যক্তিতে পরিণত হয়। যেহেতু সে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে সে যতই অন্যায়-অত্যাচার এবং পাপের কাজ করুক না কেন, তার কোন বিচার হবে না, সেহেতু সে সেগুলোর দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু ধর্ম মানুষের মনের মধ্যে পরকাল তথা কিয়ামত দিবস ও দোযখ-বেহেশতের ধারণা গেঁথে দেয়। ফলে সে ভালো কাজ করতে উৎসাহী হয় এবং পাপ কাজ হতে দূরে থাকে।

৩. সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন : ধর্ম মানুষের সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়। সামাজিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত তার দিক-নির্দেশনা দেয় ধর্ম। ধর্ম পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, অনাথ, মুসাফির– সকলের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে। বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার দ্বারা এ সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্ভব নয়। বস্তুবাদী সব সময় নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যুক্তরাষ্ট্র তার উৎপাদিত গমের বাজারমূল্য ঠিক রাখার জন্য লক্ষ-কোটি মেট্রিক টন গম সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করছে। অন্যদিকে আফ্রিকায় হাজার হাজার লোক দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বস্তুগত চিন্তা তাকে এ কাজ করতে বলছে। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই ইসলাম বলছে– তোমার প্রতিবেশী যদি অভুক্ত থাকে, আর তুমি পেট পুরে খাও, তবে তোমার কোন ইবাদতই গ্রহণ করা হবে না। তেমনি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া, অনাথের অধিকার হরণ না করা ইত্যাদি সামাজিক কল্যাণকর কথা ধর্ম বলে থাকে যার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে– মানুষে মানুষে সৌহার্দ্র বৃদ্ধি পায়।

৪. জাতি-বর্ণভেদ দূরীকরণ : মানুষের মধ্যে যে জাতি-বর্ণভেদ রয়েছে তা দূর করা বস্তুবাদী চিন্তা দিয়ে সম্ভব নয়। মানবতা ও সভ্যতার স্বঘোষিত ঝাণ্ডাধারী আমেরিকার নিউইয়র্কের বর্ণবাদী দাঙ্গা অথবা ফ্রান্সের প্যারিসে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অথচ ধর্ম মানুষের কর্মের দিকটিকেই বড় করে দেখে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে : আলাহ্‌র নিকট ঐ ব্যক্তি অধিকতর প্রিয় যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী।

৫. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ : ধর্ম মানুষকে কৃতজ্ঞ হতে শেখায়। সে যখন সকল সৃষ্টি নিয়ে, নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে– গবেষণা করে, তখন অনুভব করে যে, স্রষ্টা তাকে অনুগ্রহ করে সৃষ্টি করেছেন; তিনি অফুরন্ত উপকরণ দিয়েছেন ভোগ করার জন্য– যার কোন কিছুই তার নিজের অর্জন নয়, তখন সে বিনয়ী হয়, কৃতজ্ঞ হয়। কোনরূপ অহংকার,

আত্মগরিমা, হিংসা-দ্বেষ তার মধ্যে জন্ম লাভ করতে পারে না, সে অন্যদের হীন মনে করে না। এভাবেই সে প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়।

৬. সম্ভাব্য ক্ষতি এড়ানো : প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষই সম্ভাব্য ক্ষতি এড়ানোর জন্য আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন একজন চাল ব্যবসায়ী যদি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারেন যে, কয়েকদিন পর চালের দাম পড়ে যাবে, তাহলে তিনি পূর্বেই সব চাল বিক্রি করে দেবেন অথবা নতুন করে চাল ক্রয় করবেন না। তেমনি যদি কোন দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ জানতে পারে যে, প্রতিবেশী দেশ তার ওপর আক্রমণ করার জন্য সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করছে, তাহলে সেই দেশ অবশ্যই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকবে না। ধর্মও মানুষকে সম্ভাব্য ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্ক করে দেয়।

শত-সহস্র বছর ধরে যে সব ব্যক্তিত্ব স্রষ্টা, ধর্ম, পরকাল সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেছেন তাঁদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা সকলেই ছিলেন সত্যবাদী এবং সেসব যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ। যদি মনে করা হয় যে, পরকাল নেই এবং এটিই সত্য প্রতিপন্ন হয় তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই। কিন্তু যদি সেসব সত্যবাদী ব্যক্তির কথা মতো দোযখ-বেহেশতের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে মানুষের অবস্থা কেমন হবে? তাই সম্ভাব্য ক্ষতি এড়ানোর জন্যও ধর্ম শিক্ষা করা প্রয়োজন।

হয়তো কেউ কেউ এমন বাহানা দাঁড় করাতে পারেন যে, কোন সমস্যা সমাধানে মানুষ তখনই প্রচেষ্টা চালায় যখন তা সমাধানের কোন পথ খুঁজে পাবার আশা থাকে। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কিত কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে ফল পাবার খুব একটা আশা নেই। ফলে মানুষ সেসব কাজের পেছনেই সময় ও শ্রম দেবে যেগুলো থেকে ফল পাওয়ার ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত বেশি আশাবাদী হবে।

এর জবাবে বলতে হয়, প্রথমত ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলোর সমাধানের ব্যাপারে আশাবাদ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সমাধানের চেয়ে কম নয়। কারণ, এমন অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় আছে, কয়েক দশক অবিরাম প্রচেষ্টার পর যেগুলোর সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়ত সম্ভাবনার মূল্য কেবল একটি কারণের অনুগামী নয়, বরং সম্ভাব্য বিষয়ের পরিমাণও বিবেচনা করতে হয়। যেমন- যদি কোন একটি অর্থনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে

লাভ অর্জনের সম্ভাবনা ৫% এবং আরেকটি কাজের ক্ষেত্রে ১০% হয়, কিন্তু প্রথম কাজের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য মুনাফার পরিমাণ ১০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় কাজের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য মুনাফার পরিমাণ ১০০ টাকা হয়, তাহলে প্রথম কাজটি দ্বিতীয় কাজটির চেয়ে ৫ গুণ বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য, যদিও প্রথম কাজটিতে লাভ অর্জনের সম্ভাবনা দ্বিতীয় কাজটির লাভ অর্জনের সম্ভাবনার অর্ধেক।

নিম্নে সমীকরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো :

$$১০০০ \times \frac{৫}{১০০} = ৫০ \text{ .....(১)}$$

$$১০০ \times \frac{১০}{১০০} = ১০ \text{ .....(২)}$$

$$৫০ \div ১০ = ৫ \text{ .....(৩)}$$

অতএব, ৩ নং সমীকরণ হতে প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় সমীকরণ অপেক্ষা প্রথম সমীকরণ ৫ গুণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

যেহেতু ধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণার সম্ভাব্য লাভের পরিমাণ অসীম, সুতরাং চূড়ান্ত ফল লাভের সম্ভাবনা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, এ সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রচেষ্টার গুরুত্ব অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে বেশি। কারণ ঐগুলোর ফল সীমাবদ্ধ।

বিষয়টিকে সমীকরণে এভাবে দেখানো যায় :

$$\infty \times \frac{\infty}{১০০} = \infty$$

অতএব, শুধু তখনই ধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে যুক্তিসংগত হবে যখন মানুষ ধর্ম মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে অথবা এতৎসংক্রান্ত বিষয়সমূহ সমাধানযোগ্য নয় বলে নিশ্চিত হবে। কিন্তু এ ধরনের নিশ্চয়তা কোথা থেকে আর কিভাবে অর্জিত হবে?

তাই বলা যায় পার্থিব এবং পারলৌকিক জীবনে সৌভাগ্য ও কল্যাণের জন্যই মানুষকে ধর্মের অনুসারী হতে হবে।

পৃথিবীতে বিদ্যমান ধর্ম : পৃথিবীতে দু'ধরনের ধর্ম বিদ্যমান। যথা :

১. **সত্য ধর্ম :** ঐ ধর্ম যা সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের সমন্বয়ে গঠিত এবং এমন সব আচরণের নির্দেশ দেয় যা সত্য ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিশ্চয়তার অধিকারী।

২. **মিথ্যা ধর্ম :** যেসব ধর্ম কালক্রমে বিকৃত হয়ে গেছে সেসব ধর্ম।

ধর্মসমূহের পার্থক্যের কারণ

বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণেই একাধিক ধর্ম, ধর্মীয় উপদল ও মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছে। যেমন : কোন কোন নবীর নবুওয়াতের ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণে ইহুদি, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে বিশ্বাসগত ও আচরণগত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। আবার আলাহ্‌র রাসূলের উত্তরাধিকার প্রশ্নে শিয়া-সুন্নী মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

ধর্মের অংশ : প্রতিটি ধর্মের দু'টি অংশ রয়েছে। যথা :

১. আকীদা : স্রষ্টার অস্তিত্ব, স্রষ্টা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়, নবিগণ এবং তাঁদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, পরকাল ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশ্বাসকে আকীদা বলে। আর এ সব মৌলিক বিশ্বাসই হলো উসূলে দীন (اصول الدّين) বা ধর্মের ভিত্তি। বিশ্বদৃষ্টি এর সাথে সম্পর্কিত হয়।

২. নিযাম বা ব্যবস্থা : ব্যবহারিক বিধি-বিধান যা মানব জাতির জীবনধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল করে। একে ধর্মের শাখা (فروع الدين) বলা হয়। মতাদর্শ এর সাথে সম্পর্কিত হয়।

ইসলাম ধর্ম : মহান আল্লাহ্‌ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে যে ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন সেই ধর্মকে ইসলাম ধর্ম বলা হয়। ইসলাম ধর্মের দু'টি বিষয় রয়েছে : আকীদা ও নিযাম।

১. **আকীদা :** আকীদা হলো ধর্মের ভিত্তি বা উসূলে দীন। ধর্মের যে বিষয়গুলো নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করতে হয় সেগুলোই উসূলে দীন। উসূলে দীনের আলোচিত বিষয় মূলত তিনটি : স্রষ্টার অস্তিত্ব, নবুওয়াত ও কিয়ামত। কিন্তু স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহ্‌র ন্যায়পরায়ণতা এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর ওফাতের পর তাঁর উত্তরাধিকারের বিষয়টি নিয়ে

ব্যাপক আলোচনার প্রেক্ষিতে এ দু'টি বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে এগুলোকে উসূলে দীনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে কারো অনুসরণ করা যাবে না।

২. **নিযাম :** মহান আল্লাহর ইবাদতের নিয়ামাবলি, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয তথা ধর্মের হুকুম-আহকামগুলোকে নিযাম বলা হয়েছে। যেমন : নামায, রোযা, হজ, যাকাত, মানুষের সাথে লেনদেন ইত্যাদি বিষয়গুলো ধর্মীয় উৎস থেকে গ্রহণ করে মেনে চলতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থ : আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ তাকী মিসবাহ ইয়াযদী প্রণীত 'আকায়েদ শিক্ষা'; আয়াতুল্লাহ মুজতবা মুসাভী লারী প্রণীত 'আল্লাহকে কেন মানতে হবে'।

কোরআনের ঐশী স্বরূপ

রমজান আলীতাবার ফিরুযজায়ী

সারসংক্ষেপ

দ্বীন পরিচিতির ক্ষেত্রে অন্যতম মূলনীতি এবং ভিত্তিমূল হলো দীনের উৎস ও দলিলের সঠিক পরিচিতি। দ্বীনের উৎসগুলোকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করা সম্ভব; এক ভাগ হলো থিওরিটিক্যাল বা তত্ত্বগত ও চিন্তাগত উৎস এবং অপরটি হলো প্রয়োগিক বা ব্যবহারিক উৎস। দ্বীনের তত্ত্বগত উৎস হলো সরাসরি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা।[১] আর দ্বীনের প্রয়োগিক বা ব্যবহারিক উৎসের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা উদ্ঘাটিত ও প্রকাশিত হয়।[২] প্রয়োগিক বা ব্যবহারিক উৎসকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা সম্ভব। এর একটি অভ্যন্তরীণ উৎস ও অপরটি বাহ্যিক উৎস। অভ্যন্তরীণ উৎস হলো আকল বা বুদ্ধিবৃত্তি এবং বাহ্যিক উৎস হলো কোরআন ও সুন্নাহ। এগুলোই হলো দ্বীনের উৎস ও দলিল এবং এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে জানা সম্ভব।

কোরআন–যা হলো আল্লাহর ওহীনামা ও শরীয়তসংক্রান্ত গ্রন্থ–দীনকে বোঝার বাহ্যিক উৎস এবং আল্লাহ এ কোরআনকে মানবজাতির হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কোরআন কি ওহী, ঐশী বাণী ও খোদায়ী প্রত্যাদেশ? নাকি রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিগত আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন? যদি কোরআন আসলেই ওহী হয়ে থাকে তাহলে শুধু এর বিষয়বস্তুই কি ওহী? নাকি এর মূল পাঠ ও বিষয়বস্তু উভয়ই ওহীর অন্তর্ভক্ত?! ওহী ও খোদায়ী

---

১. তাঁর সকল ইচ্ছা হিকমত ও প্রজ্ঞাময় এবং সৃষ্টির কল্যাণ এবং অকল্যাণের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যেমন: আল্লাহর ইচ্ছা হলো মানবজাতি রোজা রাখবে কারণ রোজাতে মানুষের কল্যাণ রয়েছে। আবার মদ মানুষের জন্য ক্ষতিকর তাই আল্লাহর ইচ্ছা হলো মানুষ যেন মদ না খায়। - অনুবাদক

২. ব্যবহারিক উৎসকোরআনের মাধ্যেমে আমরা রোজা ও মদ সম্পর্কে আল্লাহর ইচ্ছার কথা জানতে পারি।- অনুবাদক

প্রত্যাদেশ কি আসলে এক ধরনের ব্যক্তিগত আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন? এ প্রবন্ধে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো প্রথমত মূল পাঠ অর্থাৎ শাব্দিক দিক এবং বিষয়বস্তুগত দিক- উভয়ই দিকই আল্লাহর ওহীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, কোরআন এমন এক ওহী ও খোদায়ী প্রত্যাদেশ যা ধর্মীয় অথবা ব্যক্তিগত আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের উর্ধ্বে একটি বিষয়। এ বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদদের বিভিন্ন মতের পর্যালোচনার পাশাপাশি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাসমূহ

দ্বীন ও ধর্ম, ওহী, কোরআন, ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন, নবুওয়াতি আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন, অভিজ্ঞতালব্ধ ও ব্যবহারিক ওহী।

ওহী পরিভাষাটির বিশ্লেষণ

ওহী এবং এর বর্ণমূল থেকে উৎপত্তি হওয়া অন্যান্য শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও ব্যবহার রয়েছে। এর অন্যতম হলো ইশারা ও ইঙ্গিত, ইলহাম ও অন্তরে প্রক্ষেপণ, সহজাত ও প্রকৃতিগত হেদায়াত, শরিয়তী হেদায়াত ও দিকনির্দেশনা[৩]। কোন কোন অভিধানের লেখক ওহীর প্রাথমিক অর্থ গোপনে স্থানান্তর ও প্রেরণ করাকে উল্লেখ করেছেন[৪]। গোপন স্থানান্তরের ওপর ভিত্তি করেই এর অন্যান্য সকল অর্থ ও ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবেও একই ধরনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ওহীর এ অর্থটি সঠিক বলে মনে করা হয়; যেমন অস্তিত্ব ও সৃষ্টিসংক্রান্ত হেদায়াত, সহজাত ও প্রকৃতিগত হেদায়াত, ইলহাম, নবীদের শরিয়তের বার্তার অনুধ্যান, ইশারা, গোপন লিখন অর্থে এটি ব্যবহৃত হতে পারে। উল্লিখিত এ অর্থগুলোতে অনুধাবন, গোপনে ও দ্রুত প্রেরণের বিষয়টি লুকিয়ে রয়েছে।

---

৩. ফিরুজাবাদী, তারিখ অনুল্লিখিত, ওহী শব্দের ব্যখ্যায়; ইবনে ফারেস, তারিখ অনুল্লিখিত, ওহী শব্দের ব্যখ্যায়; ফাইয়ুমী, ১৪০৫, ওহী শব্দের ব্যখ্যায়।

৪. ইবনে ফারেস, তারিখ অনুল্লিখিত ওহী শব্দের ব্যখ্যায়; ইবনে মানজুর, তারিখ অনুল্লিখিত, ওহী শব্দের ব্যখ্যায়; ফিরুজাবাদী, তারিখ অনুল্লিখিত, ওহী শব্দের ব্যখ্যায়।

ওহী শব্দটি কোরআনে বিভিন্ন অর্থে ও বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষভাবে আল্লাহর সাথে রাসূল (সা.)-এর শরীয়তি হেদায়াত প্রেরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে শরীয়তি হেদায়াতের বাইরে অন্যান্য অর্থে এ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনার কর্মকৌশল[৫], প্রাণীর প্রকৃতিগত কর্মকৌশল[৬], ইলহাম ও অন্তরে প্রক্ষেপণ[৭] ও ইশারা[৮] উল্লেখযোগ্য।

যেহেতু আল্লাহর সাথে রাসূল (সা.)-এর সম্পর্ক এবং ঐশী জ্ঞানশিক্ষা বিশেষ ভাবার্থের মাধ্যমে এবং গোপনে সংগঠিত হয়েছে, তাই কোরআনে 'ওহী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

নবীদেরকে আল্লাহর ওহী পাঠানোর ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা হলো গোপনে ও দ্রুত জ্ঞান অর্জন করা; অন্য ভাষায় নবীরা আল্লাহর ঐশী বার্তাকে অন্যদের থেকে দ্রুত ও গোপনভাবে অর্জন করেন। এ কারণে কালামশাস্ত্রের পরিভাষা অনুসারে ওহী হলো : 'আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তাঁর বিশেষ বান্দাদের জন্য শরীয়তি হুকুম-আহকাম ও জ্ঞানের অনুধাবন।' এ ধরনের ওহী বিশেষভাবে আল্লাহর নবীদের জন্য। অন্যভাবে বলা যায় ওহী হলো : 'আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত ব্যক্তির জন্য এক শ্রেণির জ্ঞান ও বাস্তবতার অনুধাবন যা গতানুগতিক পদ্ধতি, যেমন : পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি, ইরফানের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বাইরে মানবজাতির হেদায়াত ও প্রচারের জন্য অর্জিত হয়।'[৯]

এ কারণে 'ওহী' শব্দটি পরিভাষার ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের তুলনায় সীমাবদ্ধ ও বিশেষ অর্থে নবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা তাবাতাবাঈ (রহ.) এ সম্পর্কে লিখেছেন : 'ইসলামী সাহিত্যে 'ওহী' শব্দটি নবীদের সাথে আল্লাহর কথোপকথন ছাড়া অন্য কোন অর্থে ব্যবহার না করার বিষয়টি অলিখিতভাবে নির্ধারিত হয়েছে।'[১০]

৫. ফুসসিলাত : ৯-১২।
৬. নাহল : ৬৭-৬৮।
৭. কাসাস : ৭।
৮. মারইয়াম : ১০-১১।
৯. আবদে, ১৩৫৮ ফারসি সাল : ৫৭; যাহাবি, ১৪০৬ হিজরি : ১০।
১০. আল্লামা তাবাতাবাঈ (র.), ১৩৮১ ফারসি সাল : ২৯২।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, নবুওয়াতি ওহী বস্তু জগতের উর্ধ্বের বিষয় এবং মানবজাতির প্রচলিত জ্ঞানের বাইরে এক বিশেষ ধরনের জ্ঞান ও পরিচিতি যা বিশেষ ব্যক্তিরা অর্জন করতে পারেন।

মানুষের জ্ঞান কয়েকটি নির্দিষ্ট পথে অর্জিত হয়। যেমন : ইন্দ্রিয়গাহ্য ও পরীক্ষার মাধ্যমে, বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে, ইরফানের প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে। কিন্তু নবুওয়াতি ওহী এর কোনটির মাধ্যমে অর্জিত হয় না। ওহীর বিশ্লেষণ ও বর্ণনার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন : ওহীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক তাফসীর, ইরফানী ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ। তবে ওহীর তাফসীর করার ক্ষেত্রে এগুলোর প্রত্যেকটিরই সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং এ পথ ও পদ্ধতিগুলোতে ওহীর প্রকৃত তাফসীর সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করা সম্ভব নয়। ওহীর বিশ্লেষণ ও পরিচিতির উত্তম পথ হলো স্বয়ং ওহী এবং কোরআনকে ব্যবহার করা।

কোরআনে শরিয়তি ওহীর অনেক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনের দৃষ্টিতে নিশ্চিত ও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য বিষয় হলো ওহী রাসূল (সা.)-এর বক্তব্য ও চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তি না। বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনামূলক অনেক দলিল এ বিষয়কে নির্দেশ করে। কোরআন এর কোন কোন আয়াতে একে অদৃশ্য ও মানবিক শক্তির উর্ধ্বের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছে। এ সংক্রান্ত আয়াত হলো :

وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ ۖ وَإِذًا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

'আমরা তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ (ওহী অনুযায়ী চলার যে নির্দেশ দান) করেছি তারা তা হতে তোমাকে বিচ্যুত করার নিকটবর্তী হয়েছিল যাতে তুমি তার (প্রত্যাদেশের) পরিবর্তে (তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে) অন্য কিছুকে আমাদের ওপর মিথ্যা আরোপ কর এবং তাহলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। আমরা যদি তোমাকে (নিষ্পাপত্বের বৈশিষ্ট্য দানের মাধ্যমে) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না রাখতাম, তবে নিঃসন্দেহে তুমি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ার নিকটবর্তী হতে। সেক্ষেত্রে আমরা তোমাকে জীবনেও (ইহকালে) দ্বিগুণ শাস্তি এবং মৃত্যুতেও

(পরকালে) দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম । অতঃপর তুমি আমাদের বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পেতে না।' (বনী ইসরাইল : ৭৩-৭৫)

অন্য আরেক আয়াতে সাবধান করে এসেছে :

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

'এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। সে যদি আমার নামে কোন কথা উদ্ভাবন করত, তবে অবশ্যই আমরা তার ডান হাত ধরতাম, অতঃপর অবশ্যই তার কণ্ঠ-শিরা কেটে দিতাম।' (সূরা হাক্কাহ : ৪৩-৪৬)

একইভাবে কোরআনের অন্যান্য আয়াত নির্দেশ করে যে, কোরআন কোন ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তি নয়; বরং অদৃশ্য জগতের ও বুদ্ধিবৃত্তির উর্ধ্বের বিষয়।

এ কারণে ওহী ইন্দ্রিয়গাহ্য পরীক্ষামূলক, বৃদ্ধিবৃত্তিক, ইরফানী ও আধ্যাত্মিক কোন জ্ঞান নয় বরং এটি নিজে নিজে অর্জন করা যায় না এমন এক ধরনের উপস্থিত জ্ঞান। এ ধরনের জ্ঞান সম্পর্কে জানতে হলে এর প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এ জ্ঞান প্রমাণ করতে হলে এটুকুই প্রমাণ করা যথেষ্ট যে তা অর্জিত কোন জ্ঞান নয়।এ অবস্থায় এ বিষয়টি প্রামাণিত হবে যে কল্পনার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানঅনর্জিত উপস্থিত জ্ঞানের বিপরীত অবস্থানে করছে এবং এদের মধ্যে পরস্পরবিরাধী সম্পর্ক রয়েছে। ওহী উপস্থিত জ্ঞান হওয়ার বিষয়টি আয়াত থেকে অনুধাবন করা সম্ভব। এদের মধ্যে অন্যতম হল,

فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ﴿١١﴾ أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾

'তখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা প্রত্যাদেশ করলেন। তার অন্তর যা দেখেছে তা মিথ্যা বলেনি; সে যা দেখেছে সে ব্যাপারে কি তোমরা তার সাথে বিবাদ কর?' (নাজ্‌ম : ১০-১২)।

প্রথম আয়াতটি আল্লাহর নবীদের প্রতি সরাসরি ওহীর বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। পরের আয়াতটিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীরা যা গ্রহণ করেন সে বিষয় যে কোন ধরনের ভুল-ত্রুটি ও সন্দেহের উর্ধ্বের কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে মুশরিকদেরকে কঠোর তিরস্কার করা হয়েছে যে, কেন তার ধর্মীয় ও সহজাত বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর সাথে বিতর্ক করে। এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে ওহীর অনর্জিত, উপস্থিত ও ভুলের উর্দ্ধের জ্ঞানের বিষয়টি প্রমাণ করে।

কোরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহর ওহী হওয়া সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি

কোরআন আল্লাহর ওহী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি অনুমানের ওপর আলাদাভাবে আলোচনা করতে হবে। এ আলোচনার সম্ভাব্য নিম্নরূপ অনুমান হল,

১. রাসূল (সা.)-কে ওহীর মাধ্যমে শুধুমাত্র কোরআনের ঐশী জ্ঞান নাযিল করা হয়েছিল। রাসূল (সা.) এ জ্ঞানকে ব্যক্তিগতভাবে শব্দে ও বাক্যে রূপান্তর করে মানুষের মাঝে উপস্থাপন করেছেন[১১]।

২. কোরআনের অর্থ ও জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে কিন্তু এর শব্দ ও বাক্য হল ওহী নাযিলকারী ফেরেশতার পক্ষ থেকে, যা রাসূল (সা.) জন্য এনেছিলেন।[১২]

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এ মতটির ক্ষেত্রে ইজমা ও ঐক্যবদ্ধ। যারকেশী এ সম্পর্কে বলেন, 'জেনে রাখ, আহলে সুন্নাহ এ বিষয়ে একমত যে আল্লাহর কালাম উর্ধ্বজগত থেকে নাযিল হয়েছে। তারা নাযিল হওয়ার অর্থ নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিল। বলা হয়েছে : এর অর্থ হল কোরআনের প্রকাশ। আবার বলা হয়েছে: নিশ্চয়ই আল্লাহ জিবরাঈলকে উচ্চস্থান ও আকাশে থাকা অবস্থায় তাঁর কালাম ও ভাবার্থঅনুধাবন করিয়েছিলেন এবং কিভাবে তা পড়তে হয় শিখিয়েছিলেন। অতঃপর জিবরাঈল পৃথিবীতে নাযিল হয়ে আদায় করেছিলেন।'[১৩]

---

১১. সুয়ূতী, ১৪১১ : ১, ৫৮; যারাকশী, ১৪০৮ : ১, ২৯১; তাবাতাবাঈ, ১৩৯১ হিজরী : ১৫, ৩১৭।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩.প্রাগুক্ত।

৩. রাসূল (সা.)-কে ওহীর মাধ্যমে শুধুমাত্র কোরআনের শব্দ ও বাক্যসমূহ নাযিল করা হয়েছিল। রাসূল (সা.) এ শব্দ ও বাক্যসমূহ থেকে উচ্চ ও গভীর অর্থ অনুধানবন করেছে।

৪. কোরআনের শব্দ, বাক্য এবং এর অর্থ ও মূলবিষয়বস্তু সবই ব্যক্তি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কোরআনের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক হল আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.)-এর অস্তিত্বে এই শব্দ ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন। আল্লামা তাবাতাবাঈ (রহ.)-এরবক্তব্য থেকে এ মতে বিশ্বাসীদের বিষয়ে জানা যায়।তিনি এর বিপক্ষে কোন যুক্তি পেশ না করে শুধু এদৃষ্টিভঙ্গিকে ভুল উল্লেখ করেছেন। তার মত হল :

'এর চেয়েও দুর্বল মত হল যারা বলে যে, কোরআনের শব্দ, বাক্য এবং এর অর্থ ও মূলবিষয়বস্তু সবই ব্যক্তি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।যা পবিত্র সত্তা রূহুল আমীন থেকে রাসূল (সা.)-এর অন্তরে নাযিল হয়েছে'[১৪]।

৫. কোরআনের উচ্চ ও গভীর ভাবার্থ ও জ্ঞান এবং এর শব্দ ও বাক্য সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। কোরআনের সার্বিক জ্ঞানকে কোন ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই মানুষের নিকট উপস্থাপন করেছেন[১৫]।

উল্লিখিত মতগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন কোন মতকে তাফসীর ও উলুমূল-কোরআনের কোন কোন বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ার সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব এবং এগুলো থেকে কেবল মাত্র তিনটি মতকে তারা গ্রহণ করেছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় মত সম্পর্কে বলা যায় যে, এ দুটি মতের ফলাফল একই আর তা হল কোরআনের অর্থ ও বিষয়বস্তু হল আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ কারণে কোরআনের ওহীর প্রকৃতসত্তা সম্পর্কে যে সকল মতগুলো এখানে বর্ণিত হয়েছে মুসলমানদের ও চিন্তাবিদ-গবেষকদের মতেকেবলমাত্র দুটি মত গ্রহণযোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ওহী নাযীলের শুরু থেকে এ পর্যন্ত এ দুটি মতকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বেশি আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়েছে। এ দুটি মত হল,

১৪. তাবাতাবাঈ, ১৩৯১হিজরী ঃ১৫, ২৩৭।
১৫. তাবাতাবাঈ, ১৩৯১হিজরী ঃ ১৫, ৩১৭; যারাকশী, ১৪০৮ ঃ১, ২৯১।

১. কোরআনের অর্থ ও জ্ঞান আল্লাহ পক্ষ থেকে শব্দসমূহ জিবরাঈল অথবা রাসূল (সা.) -এর পক্ষ থেকে।

২. কোরআনের শব্দ, বাক্য ও অর্থ এবং এর আরবী সাহিত্যের বিন্যাস সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্থাৎ ওহী।

অন্য সকল মত কোন না কোনভাবে এ দুটি মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এ কারণে এখানে এ দুটি মত সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি এর সাথে সংশ্লিষ্ট মত যেমন,ওহী বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মওবিষয়বস্তুর প্রতিবেদন-ব্যাখ্যা সংক্রান্তমত এবং ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন সংক্রান্ত মত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১. কোরআনের বিষয়বস্তু ও জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এর শব্দ ও বাক্যসমূহ রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে

এ মতের অনুসারীরা এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা.)-কে ওহী করা হয়েছে তা শুধুমাত্র কোরআনের জ্ঞান ও মূল বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত। ওহী ছাড়া এ সম্পর্কে মানুষ পরিচিতি লাভ করতে পারতো না। কিন্তু এ বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে এর শব্দ ও বাক্যসমূহ রাসূল (সা.)-এর সৃষ্টি।

এ মতের মূল তৃতীয় হিজরীর কালাম শাস্ত্রবিদ ইবনে কাল্লাব থেকে দিকে প্রত্যাবর্তন করে[১৬]। তার মতে আল্লাহর সত্তাগত ও অনন্তকাল থেকে বিদ্যমান কথা ও বাণী যা কখনই লিখিত গ্রন্থ আকারে প্রকাশ পায় নাই। তিনি মনে করেন কোরআন নাযিল হওয়ার সময় আরবী ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণে আল্লাহর কালাম ও কথারসীমাবদ্ধতাসৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের রং ধারণ করেছে । এ কারণে কোরআন স্বয়ং আল্লাহর কালাম ও বাণী হিসেবে দাবি করা সম্ভব না[১৭]। মুসলিম চিন্তাবিদদের নিকট এ মতটি শুরু থেকে আজ পর্যন্তবিরল মত হিসেবে প্রচলিত রয়েছে।

ইসলামী জগতের কোন কোন আধুনিক লেখক এ মতের উপর প্রভাবিত হয়ে একে শক্তিশালী করা এবং প্রচার করার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে শাহ ওলীউল্লাহ

১৬. দায়েরাতুল মায়ারেফ বুযুর্গে ইসলামী, ইবনে কাল্লাব শব্দের বিস্তারিত বর্ণনাতে।
১৭. প্রাগুক্ত।

দেহলাভী[১৮] ও সাইয়্যেদ আমীর আলী হিন্দী[১৯] অন্যতম। তারা বিশ্বাস করতো কেবলমাত্র কোরআনের অর্থ ও জ্ঞান রাসূল (সা.)-এর প্রতি ওহী করা হয়েছে; এ গ্রন্থের কাঠামো এবং শব্দের বাহ্যিক বিন্যাস ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

পাশ্চাত্যেও কোন কোন ধর্মীয় কালাম শাস্ত্রবিদ ও দার্শনিক ওহীর সত্তা সম্পর্কে একই মত পোষণ করেন। পশ্চিমা বিশ্বে এ মতটিবিষয়বস্তুর প্রতিবেদন-ব্যাখ্যা সংক্রান্ত মত[২০] হিসেবে পরিচিত। এ মতটি কোরআনের ওহীর প্রকৃতি সংক্রান্ত প্রথম মতের সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। এ মত অনুসারে ওহী হল তথ্যের বিশেষ ধরনের আদান প্রদান ও স্থানান্তর। কোরআনের প্রকৃত বাস্তবতাকে এর মাধ্যমে আল্লাহ, রাসূল (সা.)-কেস্থানান্তর করেন এবং সার্বিক এই বাস্তবতার সমষ্টি হল ওহী।

এ মতটি বিস্তারিত ব্যাখ্যাকরার পূর্বে বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত পরিভাষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। যুক্তিবিদ্যা ও আধুনিক যুক্তিবিদ্যাতে যা কিছু কথা বলা ও লেখার সময় বর্ণনা করা হয়তাকেই প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা বলা হয়[২১] ।যুক্তি বিদ্যার প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যাকে এক বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব।কিন্তু বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যারপরিভাষা যার সাথে ওহীকে তুলনা করা হয়েছে,তা এক বাক্যের প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ যুক্তিবিদ্যার বাক্য বিশেষভাবে ব্যাকরণের দিকে লক্ষ রেখে তৈরি করা হয় যা অর্থবহ ও যার শব্দগুলো উচ্চারিত অথবা লিখিত আকারে হয়ে থাকেএবং বিশেষ বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে। কিন্তুবিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত পরিভাষা শুধুমাত্র কোন বাক্যে মূল বিষয়বস্তুকে বর্ণনা করে। যুক্তিবিদ্যার বাক্য এবং বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত পরিভাষার সাথে চারটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে; পার্থক্যগুলো হল:

১. কোন কোন ক্ষেত্রে মূল বিষয়বস্তু একই কিন্তু তা প্রকাশের বাক্য ভিন্ন। উদাহরণসরূপ, হাসান হোসাইন থেকে বড়; অন্যভাবে বলা সম্ভব, হোসাইন হাসান থেকে ছোট। এ দুটি বর্ণনা ভাষার ব্যাকরণ গত দিক থেকে বিপরীত অথচ

১৮. হিন্দী, ১৩৩৪ : ১,৪।
১৯. আহমাদ আমীন, ১৯৬৫ : ১৩৯-১৪০।
২০. propositional view.
২১. মূর, ১৩৮৩ : ২, ২৫৫।

মূল বিষয়বস্তুর দিক থেকে একই এবং আমরা একটি বিষয়বস্তুই পাব। যদি প্রথম বাক্যটিকে সঠিক মনে করি তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয় বাক্যটিকেও সত্য ও সঠিক মনে করবো। ঠিক এর বিপরীতে একই ঘটনা ঘটবে।

২. কোন কোন সময় বাক্য একটি কিন্তু বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা একাধিক। যে সকল বাক্যগুলোর উদ্দেশ্য[২২] সর্বনাম দিয়ে শুরু হয়েছে; যেমন: সে আসল। বাক্যটি একক ব্যাকরণ গত গঠনের আধিকারী। কিন্তু 'সে' সর্বনামটি অনেক বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করতে পারে;যেমন, সে কোন সম্মানিত বন্ধু ও আকাঙ্ক্ষিত কেউ হতে পারে অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত কোন শত্রু। ঠিক একইভাবে বাক্যে যদি এমন শব্দ থাকে যার শব্দ একটি কিন্তু অনেকগুলো ভিন্ন অর্থ রয়েছে; যেমন, বাঘের বাচ্চাকে দেখে আসলাম; এ বাক্যে বাঘের বাচ্চা বলতে বিশেষ প্রাণী অথবা কোন সাহসী ব্যক্তিকে বুঝানো সম্ভব; -এ দুই ধরনের অর্থবোধক বাক্যে, বাক্য একটি বেশি না; কিন্তু এর বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ভিন্ন।

৩. কোন কোন সময় বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা একই কিন্তু এর প্রকাশভিন্ন ভাষা কারণে ভিন্ন। কেননা বাক্য এর বিশেষ ভাষার অনুসারী; কিন্তু বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যাজরুরীভাবে কোন বিশেষ ভাষার অনুসরণ করে না; স্বতন্ত্রের অধিকারী এবং কোন বিশেষ ভাষার সাথে শর্তহীনভাবে সম্পৃক্ত।

৪. কোন বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা সত্য অথবা মিথ্যার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। কিন্তু কোন বাক্য সত্য-মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে অর্থহীন ও অর্থযুক্ত হতে পারে। বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যায় যে তথ্য ও বার্তা বহন করে তা বাস্তবতার সাথে মিলযুক্ত অথবা এর বিপরীত হতে পারে। বাক্য হল একগুচ্ছ শব্দ সমষ্টি যা বিশেষভাবে বিন্যাস করা হয়েছে অর্থহীন অথবা অর্থযুক্ত। কিন্তু কোন বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা কখনই অর্থহীন হতে পারবে না। কেননা প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা অর্থাৎ তথ্য সমৃদ্ধ, জ্ঞান সমৃদ্ধ এবং অর্থহীনতার সাথে কোন সম্পর্ক নাই; যা কিছু অর্থহীন তথ্য সমৃদ্ধ হতে পারে না[২৩]।

উল্লিখিত আলোচনা অনুসারে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি আর তা হল, বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যার মতেরউপর ভিত্তি করে ওহী এমন এক বিষয়বস্তু ভিত্তিক

২২. Subject.
২৩. Haack, ১৯৯২, ১৩-৩৩।

প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যাযা সাধারণভাবে প্রচলিত ভাষা থেকে সৃষ্ট হওয়া বাক্য থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র একটা বিষয়; যা আল্লাহ অথবা ওহী বহনকারী ফেরেশতা রাসূল (সা.)-এর অন্তরে প্রেরণ করেছেন; যা কোন বিশেষ ভাষাতেও প্রেরণ ছাড়াই যা শুধুমাত্র বার্তা ও বাণী আকারে এসেছে; রাসূল (সা.) একে বিশেষ ভাষা দান করে প্রকাশ করেছেন।

পূর্বে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, এই মতটি প্রথম মতের সাথে মিল রয়েছে;যেখানে বলা হয়েছে ওহী হল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিষয়বস্তু কিন্তু এর শব্দ ও অন্যান্য কাঠামো অন্যের সৃষ্টি। প্রায় একইভাবে ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন সংক্রান্ত মতের সাথেও মিল রয়েছে। এ মতটির অর্থ হল আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.)-এর প্রতিএক ধরনের বাস্তবতা ও জ্ঞানকে নাযিল করেছেন; কোন শব্দ ও বাক্য নাযিল হয় নাই। কিন্তুরাসূল (সা.)-এর প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছে তা বিশেষ শব্দ ও বাক্য সহকারে হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় মতটি গ্রহণযোগ্য, প্রথম মত নয়।

ওহী বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যার মত অনুযায়ী তিনটি মূল অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে।

১. বার্তা ও তথ্য প্রেরণকারী (আল্লাহ)।
২. বার্তা ও তথ্য গ্রহণকরী (নবী ও রাসূল)।
৩. বার্তা ও তথ্য (বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা)।

এ মতটি যেভাবে বলা হয়েছে কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদের মতের সাথে মিলেএবং বিশেষকরে ইসলামী দার্শনিকের[২৪]ওহীর দার্শনিক আলোচনায় ওবিশ্লেষণের মাঝে এ মিল খুঁজে পাওয়া যায়; তবে সরাসারি কেউ এ সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ করে নাই। কোন কোন দার্শনিকরা ওহী ও ভাষার প্রকৃতি বিষয় বলে ওহীকে শব্দ-বাক্য ও বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার ক্ষেত্রে মত দিয়েছেন। শহীদ মুরতাজা মুতাহ্হারী ইসলামী দার্শনিকদের এই মতকে শ্রেষ্ট মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন[২৫]।

২৪. ইবনে খালদুন, ১৪০০ : ৯১-৯২; ফারাবী, তারিখ অনুল্লিখিত, ৬৭।
২৫. মুতাহ্হারী, ১৩৭৮ : ৪, ৪১৫।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ওহী সংক্রান্ত এ দুটি মতের অভিন্ন দিক হল উভয়ই বার্তা ও তথ্যের স্থানান্তর ঘটে তবে দ্বিতীয় মত অনুযায়ী বার্তা ও তথ্যের সাথে বিশেষ ভাষার সমন্বয় হয়; কিন্তু প্রথম মতে কোন বিশেষ ভাষার সমন্বয় ঘটে না এবং এর অর্থ হল বার্তা ও তথ্যে স্থানান্তরের পর রাসূল (সা.) নিজে এগুলোকে শব্দ ও বাক্যে রূপ দান করে অন্যদের নিকট প্রচার করেন।যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছিল ঠিক একইভাবে বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত মতটি কোরআনের কোন কোন আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

পর্যালোচনা

'ওহী হল বিষয়বস্তুর প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যা।' -এ মতের অনুসারীরা তাদের দাবির পিছনে কোন যৌক্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে নি; কেবলমাত্র দাবি করেই শেষ করেছেন। সম্ভবত তাদের এ দাবির পিছনে কোরআনের কোন আয়াত সাক্ষ্য হিসেবে থাকতে পারে যেখানে সুস্পষ্টভাবে রাসূল (সা.)-এর অন্তরে ওহী নাযিল হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে; এদের মধ্যে একটি আয়াত হল,

مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلۡ يَنصُرُونَكُمۡ أَوۡ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٢﴾ فَكُبۡكِبُواْ فِيهَا هُمۡ وَٱلۡغَاوُۥنَ ﴿٩٤﴾

রুহুল (জিব্রাইল) আমীন যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমার হৃদয়ের ওপর যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (শুআরা : ১৯৩-১৯৪)

রাসূল (সা.) -এর অন্তরে ওহী নাযিল হওয়ার বিষয়টি কোন স্বাভাবিক প্রকৃতিতে কোন শব্দ ও বাক্যে সাহায্যে হওয়ার প্রয়োজন নাই[২৬]। কেননা, বাক্যের গঠন কেবল কোন বিষয়কে মানুষের বাহ্যিক ইন্দ্রিয়, কর্ণে পৌঁছানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

এ দলীলের বিশ্লেষণে মাধ্যমে আমরা এ মতটিতেবিভিন্ন দিক থেকে ত্রুটি খুঁজে পাই। কেননা, প্রথমতঃ কোরআনের অন্যান্য আয়াতের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা এর শব্দসমূহ ওহী হওয়ার বিষয় এবং আরবী গঠন ও তেলোয়াত, সুর করে তেলোয়াত (তারতীল), বাণী প্রেরণের বিষয় এর সবগুলোই কোরআনের মূলের বাহ্যিক গঠনের

২৬. সুয়ূতী, ১৪১১ : ১, ৮৫।

বৈশিষ্ট হিসেবে পরিগনিত হবে। এ ছাড়া রাসূলের নির্ভেজালভাবে ওহীর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে কোরআনের কোন আয়াতে কোরআনের আরবী ভাষায় নাযিলহওয়ার বিষয়টি সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে:

فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

'সুতরাং তোমার প্রতি যাকিছু ওহী নাযিল করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর; তুমি সরল পথে রয়েছ। (যুখরুফ : ৪৩)

ঠিক একইভাবে কোরআনে তিনশতকের অধিক আয়াতে রাসূল (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে 'বল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; এ থেকে ধারণা করা যায় যে রাসূল (সা.)-এর মূল কর্তব্য হল কোন ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই আল্লাহর বাণী প্রচার করা।

দ্বিতীয়তঃ কোরআনের শব্দ ও আরবী বাক্যেরকাঠামো ওহী হওয়ার বিষয়ের সাথে এ আয়াতগুলোর রাসূল (সা.)-এর অন্তরে নাযিল হওয়ার সাথে কোন বিপরীতমুখী সম্পর্ক নাই। কেননা ওহী উপস্থিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এর বাহ্যিক অবকাঠামোগুলোও উপস্থিত জ্ঞানের অন্তর্ভক্ত হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় ঠিক ওহীর বাস্তবতা লাভ করার ক্ষেত্রে যেভাবে এর ঐশী ভাবার্থ ও বিষয়বস্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সারাসরি ও উপস্থিতভাবে রাসূল (সা.)-এর নিকট প্রেরিত হয়েছে; যার ফলে রাসূল (সা.)-এরসত্তার প্রসার লাভ করেছে এবং জ্ঞানের সাগরের সাথে যুক্ত হয়েছেন; ঠিক একই সময় তার সত্তাতে এ সম্পৃক্ততার ফলে এর উপযোগী বাহ্যিক আরবী শব্দ ও বাক্য ও ভাবের কাঠামোর সৃষ্টি হয়েছে। আয়নার মত তাঁর আত্মার সামনে উপস্থিত হয়েছে[২৭]।

এ কারণে এখানে অন্তর (কাল্‌ব) এবং মানুষের সত্তা (নাফ্‌স)-ই দুটি শব্দের অর্থ একই যা বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুধাবন ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধিকারী। রাসূলের অন্তরে ওহী নাযিল হওয়ার আয়াতটি ওহীর প্রেরণের প্রকৃতি ও গ্রহণ করার ধরনের দিকে (উপস্থিত ও সরাসরি) লক্ষ রেখে বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের ওহী নাযিল হওয়ার সময় বাহ্যিক কোন ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা ছিল না। রাসূল (সা.) ওহী নাযীলের সময় ওহীর

২৭. তাবাতাবাঈ, ১৩৭৮ : ১০২।

ফেরেশতাকে দেখতেন এবং তার কথা শুনতেন; কোন ধরনের চোখ ও কান এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার ছাড়াই এই দেখা ও শুনার কাজটি সম্পন্ন হত[২৮]।

তৃতীয়তঃ কোরআন সূরা শুয়ারা ১৯৩ ও ১৯৪ নম্বর আয়াতে রাসূল (সা.)-এর অন্তরে ওহী নাযিল হওয়ার বিষয়টি বর্ণনার পরপরই১৯৫ নম্বর আয়াতে কোরআনকে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়নাযিল করার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন,

بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

'এটা সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।' (শুআরা : ১৯৫)

এ বিষয়টি রাসূলের অন্তরে কোরআন নাযীলের সাথে কোরআনের শব্দ ও বাক্যে ওহী হওয়ার বিষয়টির কোন বিরোধ নাই।

এ কারণে এ ভিত্তিহীন অযৌক্তিক দাবি যে কোরআনের অর্থ ও মূল বিষয়বস্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈলের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর অন্তরে নাযিল হয়েছে; রাসূল (সা.) নিজে একে শব্দ ও বাক্যেররূপ দান করেছেন। অথবা এ অযৌক্তিক দাবি যে, আল্লাহ জিবরাঈলকে প্রেরণ করেছেন; তিনি একে আরবী ভাষার রূপ দিয়ে রাসূল (সা.)-কে বর্ণনা করেছেন।

কোরআনের কোন কোন আয়াত উল্লিখিত মত বাতিল হওয়ার বিষয় উত্তম দলিল। এই আয়াত এবং রেওয়ায়েতগুলোসুস্পষ্টভাবে কোরআনের শব্দ ও বাক্য এবং এর গঠন প্রকৃতি ওহী এবং আল্লাহ পক্ষ থেকে হওয়ার বিষয়বর্ণনা করে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন,

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾

'এবং আমরা কুরআনকে (আয়াতসমূহকে) বিভক্ত করেছি যাতে তুমি মানুষের নিকট ধীরে ধীরে পাঠ করতে পার এবং আমরা তা ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করেছি।' (বনী-ইসরাঈল ঃ ১০৬)

২৮. তাবাতাবাঈ, ১৩৭৮ : ১৫, ১০৫।

এ আয়াত অনুসারে নাযিল ও আলাদা করার বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়েছিল এবং তিনি তার নিজের সাথে একে সম্পর্কিত করেছেন। রাসূল (সা.) শুধু পাঠ করার দায়িত্ব সম্পন্ন ছিল। কোরআন বলতে যে কোরআন আমাদের হাতে রয়েছে তার শব্দ ও বিষয়বস্তু উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনের অন্য আরেক আয়াতে একে নিজের বাণী হিসেবে উল্লেখ করে সুস্পষ্টভাবে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং তেলোয়াত করার বিষয়টি রাসূল (সা.)-কে দায়িত্ব দিয়েছেন কোরআনের সূরা তওবা ৬ নম্বর এবং মায়িদার ১৫ নম্বর আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

‘(হে রাসূল) যদি অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে এ কারণে যে, তারা এমন সম্প্রদায় যারা জানে না। (তওবা ঃ ৬)

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

‘হে আহলে কিতাবরা! তোমাদের নিকট আমাদের প্রেরিত পুরুষ এসেছে, সে তোমাদের জন্য এমন বহু বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যেগুলো তোমরা (আল্লাহর) গ্রন্থ হতে গোপন করতে এবং বহু বিষয় (উপেক্ষা ও) ক্ষমা করে থাকে। নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং স্পষ্টকারী গ্রন্থ (কুরআন) এসেছে।’ (মায়েদাহ : ১৫)

কারাআত ও তিলাওয়াত শব্দটি অর্থ হল কাউকে অন্যের কথাকে পুনরাবৃত্তি করা বলা হয়। এ কারণে কোরআন শব্দ, বাক্য গঠনগত দিক থেকে আল্লাহ পক্ষ থেকে; জিবরাঈলরাসূল (সা.)-কে পৌঁছানো দায়িত্ব নিয়োজিত ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর

দায়িত্ব হল শব্দ, বাক্য গঠনে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই মানুষের জন্য পুনরাবৃত্তি করা। কোরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার বিষয়টি আহলে বাইত (আ.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকেও জানা যায়। ইমাম বাকির (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, 'কোরআন,না সৃষ্টিকর্তা, না সৃষ্টি; বরং কোরআন হল সৃষ্টিকর্তার বাণী।

এ ছাড়াও কোন ব্যাক্তি থেকে যখন তার কথা পুনরাবৃত্তি করা হয় তখন এর অর্থ হল শব্দ, বাক্য ও তার কথার ধরণ ও গঠর প্রকৃতি একই হতে হবে। এ কারণে যে বাণীকে আল্লাহ নিজের বাণী হিসেবে অভিহিত করেছেন তা অবশ্যই অর্থ, শব্দের নির্বাচন এবং এদের একের সাথে অপরের গঠনের দিক থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে হবে তাহলে তাঁর বাণী বলা সম্ভব হবে। বিশেষকরে মুসলমানরা সব সময় তাদের মধ্যে থাকা এত মত পার্থক্য থাকার পরও কোরআনের গঠন প্রকৃতি ও বাক্যে ধরনের ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়ার বিষয়ে কোন ধরনের সন্ধেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয় নাই; সকলে এ বিষয়ে একমত[২৯]।

২. কোরআনের শব্দ ও বাক্যসমূহ এবং বিষয়বস্তু ও জ্ঞান সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে

ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে এ মতটি প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত রয়েছে। এ মত অনুসারে কোরআন এর সকল ঐশী বিষয়বস্তু ও উচ্চ জ্ঞান শব্দ ও বাক্যসমূহ এবং গঠন প্রকৃতি সবকিছু সহকারে রাসূল (সা.) -এর প্রতি নাযিল হয়েছে। রাসূল (সা.)-ও সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এই ঐশী বাণীকে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই মানুষকে প্রচার করেছেন। এ মতটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও কোরআন এবং রেওয়ায়েতের দিক থেকে এক শক্তিশালী হওয়ার কারণে অধিকাংশ মুসলিম গোষ্টির কাছে ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের মত প্রয়োজনীয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং অনেকে একে ইসলামের ইজমা (ঐকে) হিসেবে দাবি করেছেন[৩০]।

---

২৯. মারেফাত, ১৪১৭ ঃ ১, ২৭৩-২৭৪।

৩০. যারকানী, তারিখ অনুল্লিখিত ঃ ১, ৪৪; যারাকশী, ১৪০৮ ঃ ১, ২৯০;মারেফাত, ১৪১৭ ঃ ১, ২১১; শাহরেস্থানী, ১৩৬৮ ঃ ১, ৬০।

ব্যাক্তি রাসূল (সা.)-এর কোরআনকে সকল ধরনের পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যপক প্রচেষ্টা করেছেন। তার এ চেষ্টার মধ্যে অন্যতম হল কোরআন সঠিক ও সুক্ষ্মভাবে সংরক্ষনের জন্য লিখিত রাখার নির্দেশ দান। কোন আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে তা শিক্ষা দান। বিভিন্ন অঞ্চলে কোরআন শিক্ষার জন্য ইসলামের প্রচারক (মুবাল্লিগ) প্রেরণ করা। সবসময় কোরআনপাঠ এবং মুখস্ত (হেফজ) করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। এ সকল কর্মতৎপরতা এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে শব্দ ,বাক্য, এর বাহ্যিক গঠন প্রকৃতি সবই এর বিষয়বস্তুর মত ঐশী উৎসমূল থেকে উৎপত্তি ঘটেছে।

এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ক. কোরআনের বিষয়বস্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে।
খ. বিষয়বস্তু ছাড়াও কোরআনের প্রতিটি শব্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে।
গ. আয়াতের আকারে শব্দগুলোর গঠন আল্লাহর পক্ষ থেকে।
ঘ. সূরার আকারে আয়াতের সমষ্টি আল্লাহর পক্ষ থেকে।
ঙ. বর্তমান কোরআনের সূরাগুলোর সারিবদ্ধতার বিন্যাসও আল্লাহর পক্ষ থেকে।

কোরআনের শব্দ ও বাক্য এবং বিষয়বস্তু ও জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হওয়ার বিষয়টি জন্য অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ আনা সম্ভব। এখানে এদের মধ্য হতে কিছু সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হল,

১. **উদ্ধিতিভিত্তিক সাক্ষ্য :** কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেকে আল্লাহর বাণী হিসেবে পরিচয় করিয়েছে।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

‘(হে রাসূল) যদি অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে এ কারণে যে, তারা এমন সম্প্রদায় যারা জানে না।’ (তওবা ঃ ৬)

سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا۟ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

'তোমরা যখন যুদ্ধের আর্জিত গনিমত সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে, 'আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও।' তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল, 'তোমরা কোন অবস্থাতে আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ আগেই এ ধরনের ঘোষণা করেছেন।' তারা অবশ্যই বলবে, 'তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করছ।' মূলত তাদের অনুধাবন ক্ষমতা কম।" (ফাত্হ ঃ ১৫)

এ দুটি আয়াতে কোন বক্তার বাণী ও বক্তব্যকে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত করার ক্ষেত্রে তখনি যুক্তিযুক্ত ও বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে যখন বক্তা নিজে বিষয়বস্তুর বর্ণনার পাশাপাশি শব্দের বিন্যাস ও বাক্য গঠনের দায়িত্বে থাকে[৩১]।

যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র অন্যকে ভাব ও বিষয়বস্তু দেয়। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শব্দ নির্বাচন করে বাক্য গঠন করে তাহলে এ বাণীকে দ্বিতীয় ব্যক্তির বাণী হিসাব করা হয়। প্রথম ব্যক্তির সাথে এ বাণীকে সম্পৃক্তকরণ কখনই যৌক্তিক ও সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে না[৩২]। কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলো আমাদের দাবির সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হল।

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٤﴾

৩১ মারেফাত, ১৪১৭ ঃ ১, ২১০।
৩২ মারেফাত, ১৪১৭ ঃ ১, ২১০; যারকানী, তারিখ অনুল্লিখিত ঃ ১, ৪৪।

'আমরা আমাদের বান্দা (মুহাম্মাদ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা (রচনা করে) নিয়ে এস এবং আল্লাহ ভিন্ন তোমাদের আর যত সাক্ষ্যদাতা (ও সাহায্যকারী) আছে, সকলকে আহ্বান কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও । তোমরা যদি তা না করতে পার, আর নিশ্চয়ই তা পারবেও না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর এবং তা প্রস্তুত করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।' (বাকারা : ২৩-২৪)

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٣٤﴾

'তারা কি বলে, 'এটা (কুরআন) সে স্বয়ং রচনা করেছে?' বরং তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়। তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক।' (তূর : ৩৩-৩৪)

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣٨﴾

তারা কি বলে, 'সে (রাসূল) এটা (আল্লাহর ওপর) মিথ্যা আরোপ করেছে?' তুমি বল, 'তোমরা তদনুরূপ একটি সূরা আন এবং আল্লাহ ব্যতীত সাহায্যের জন্য যাকে পার আহ্বান কর; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (ইউনুস : ৩৮)

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

তারা কি বলে, 'সে এটা (আল্লাহর ওপর) আরোপ করেছে?' তুমি বল, 'তোমরাও এর অনুরূপ দশটি অনরূপ সূরা আন এবং আল্লাহ ব্যতীত যাকে ইচ্ছা সাহায্যের জন্য আহ্বান কর; যদি তোমরা (তোমাদের দাবিতে) সত্যবাদী হও।' এতদসত্ত্বেও যদি

তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখ, এটা কেবল আল্লাহর জ্ঞানে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে? (হূদ : ১৩-১৪)

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

তুমি বল, 'যদি মানুষ ও জীন এ কুরআনের সদৃশ আনার জন্য সমবেত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে সক্ষম নয়। যদিও (এ বিষয়ে) তারা একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা করে (সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে)। (বনী ইসরাইল : ৮৮)

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

'সামনে ও পিছন থেকে কোন মিথ্যা (বাতিল) এতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ (কোরআন) প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে। (হা-মীম আস্-সাজদা : ৪২)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

'তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও নিকট হতে হত তবে তারা এতে বহু অসংগতি পেত।' (নিসা : ৮২)

২. **কোরআনের মো'জেযা বা অলৌকিকতা :** কোরআনকে অলৌকিক বিষয় প্রমাণের মাধ্যমে এর শব্দ ও বাক্য এবং বিষয়বস্তুকেও ওহীর অন্তর্র্ভুক্ত বিষয় প্রমাণ করা অতি সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। কোরআনের অলৌকিক বিষয় প্রমাণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে; এদেরকে এখানে তিন ভাগে সাজানো সম্ভব,

   ক. কোরআনের শব্দের অলৌকিকতা।
   খ. কোরআনের বিষয়বস্তুর অলৌকিকতা।
   গ. কোরআনের পদ্ধতির অলৌকিকতা।

কোরআনের শব্দের অলৌকিকতার বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। এদের মধ্যে শব্দের অলঙ্কারের অলৌকিকতা, শব্দের সংখ্যার অলৌকিকতা অথবা কোরআনের সার্বিক অলঙ্কার, বিন্যাস, পদ্ধতির অলৌকিকতা অন্যতম[৩৩]। এর সবই কোরআনের শব্দ ও সাহিত্যের অলৌকিকতা অন্তর্ভক্ত যা বাক-অলংকার, সুন্দর বাচনভঙ্গি, প্রাঞ্জলতাএবং শৃংখলা ও বর্ণনার পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ দিকে থেকে কোরআন কোন মানুষ এবং সবচেয়ে বড় ও বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকের সৃষ্ট বাণীর উর্ধ্বের বিষয়।

কোরআনের বর্ণনার অলৌকিকতার একটি উত্তম সাক্ষ্য হলকোরআন নাযিল হওয়ার পর এর বিপরীতে সাহিত্যের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা। কোন কোন কাফিরদের নেতারা কোরআনের সাথে প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র হেরেই যায় নাই; কোরআনের মহিমা ও উচ্চ মর্যাদা তাদেরকে মোহগ্রস্ত ও পরাভূত করেছে;তারা কোরআনে উচ্চ মার্যাদা সম্পর্কে স্বীকার বাধ্য হয়েছে। কোন ব্যক্তিরা কোন উপায় না দেখে কোরআনকে যাদু এবং রাসূল (সা.)-কে যাদুকর হিসেবে অপবাদ দিয়েছিল এবং এর সংক্ষিপ্ত আয়াত শ্রবণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেহেতু মানবজাতিকে কোরআনের তার আয়াতের মত এরকম সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অপারগতার বিষয়ে চ্যলেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল এবং কাফেরদের এ অপরাগতার কারণে বিভিন্নভাবে রাসূল (সা.)-এর কথা অন্যদের কানে না পৌঁছানোর পথ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল[৩৪]।

কোরআনের বিষয়বস্তুর অলৌকিকতার জন্য বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হয়েছে।এদের মধ্যে অন্যতম হল, এর মধ্যে কোন বিপরীতমুখী কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না, অদৃশ্য জগত সম্পর্কে সংবাদ প্রদান, কোরআনে মধ্যে উচ্চ ও গভীর জ্ঞানের উপস্থিতি[৩৫]। কোরআনের আনয়নকারী, রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করলে আরেক ধরনের অলৌকিক ঘটনা লক্ষ করা যায় যাকে কোরআনের পদ্ধতির অলৌকিক ঘটনা বলা হয়। রাসূল (সা.) উম্মী ব্যক্তি (যিনি কোন পড়ালেখা করে নাই) ছিলেন। কোন সময় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যান নাই। কোন শিক্ষক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। কোন সময় কলম হাতে নেন নাই; কোন কিছু লিখেন নাই। কোরআনকে এমন

৩৩. খোমেইনী, ১৪১৮ ঃ ৪, ৪৮৪-৪৮৭; হিল্লী, ১৩৭২ ঃ ৩৮৪; সামেনী, ১৩৫২ ঃ ৪; হাদাবী তেহরানী, ১৩৭৭ ঃ ৪৮।

৩৪. তাবারসী, ১৪১৫ ঃ ৫,৩৮৭; ইবনে হিশাম, ১৩৫৯ হিজরী, ১, ২৯৩-২৯৪।

৩৫. হাদাবী তেহরানী, ১৩৭৭ ঃ ৪৯-৫০।

বৈশিষ্ট্যের একজন ব্যক্তি মানুষের নিকট প্রচার করার বিষয়টি লক্ষ রেখে বলা সম্ভব যে এর শব্দ ও বিষয়বস্তু সবই ঐশী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এ বিষয়ের সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। কেননা বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের এ নির্দেশ দেয় যে, কোরআনে মত এত উচ্চ মর্যাদার গ্রন্থ রাসূল (সা.)-এর মত বৈশিষ্টসম্পন্নব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর সাথে সম্পৃর্ক্ততা ছাড়ানাযিল হওয়া অসম্ভব[৩৬]। এ কারণে রাসূল (সা.)-এর উম্মী হওয়ার বিষয়টি এমন একটি দলীল যা দিয়ে কোরআনে শব্দ ও বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকে ঐশী হওয়ার বিষয় প্রমাণ করা সম্ভব ।

তবে এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র কোরআনের বিষয়বস্তুকে ঐশী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা সম্ভব; এর শব্দের ঐশী হওয়ার বিষয় প্রমাণ করা সম্ভব না। এ কারণে কোরআনের বিষয়বস্তুর অলৌকিকতার দলীল দিয়ে এ বিষয়টি প্রমাণ করা সম্ভব না। কেননা এ ধরনের উচ্চ অলংকার সমৃদ্ধ শব্দ ও প্রাঞ্জলময় বাক্যে ব্যবহার না করতে পারার কারণ রাসূলের উম্মী হওয়ার কারণে ঘটেনি বরং তা কোরআনের অলংকার শাস্ত্রের দিকে প্রতাবর্তন করে। এ কারণে কোরআনের শাব্দিক ও সাহিত্যিক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে তা প্রমাণ করা সম্ভব।

বক্তব্য সংক্রান্ত কর্মের মত

এ মতটি ওহী ও কোরআন সংক্রান্ত দ্বিতীয় মতের মত। এ মত অনুসারে কোরআন ও ওহীর শব্দ ও বিষয়বস্তু আল্লাহর বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মের অন্তর্ভক্ত। এ মতটি বিখ্যাত ভাষা বিষয়ক দার্শনিক জি, এল, আলিস্ট্রিনের মত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল[৩৭]। এ মতটি ভাষাকে তিন ধরনের কর্মকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

ক. বক্তব্যসংক্রান্ত কর্ম : কথা, বাণী ও বক্তব্য সংক্রান্ত কোন কর্মকে বক্তব্যে সংক্রান্ত কর্ম বলে; কোন কিছু সম্পর্কে বলা, মুখমণ্ডলের মাধ্যেমে বিশেষ শব্দ সৃষ্টি করা যা কোন শব্দের সাথে সম্পর্কিত এবং শব্দগুলো কোন ভাষার নিয়মে বিশেষ অর্থ বহন করে। বক্তব্যে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্ম তিন কাজ সম্পাদন করে থাকে; প্রথমতঃ কোন ধ্বনি মুখমণ্ডলের মাধ্যমে উচ্চারিত হবে। দ্বিতীয়তঃ এ ধ্বনিগুলো বিশেষ ভাষার শব্দের

৩৬. মুতাহহারী, ১৩৫৯ ঃ ৬-১১।
৩৭. কায়েমীনীয়, ১৩৮১ ঃ ৬৯।

সাথে সম্পর্কিত এবং যা ঐ ভাষার ব্যকরণের নিয়ম অনুসারে গঠিত হয়েছে। তৃতীয়তঃ যা মুখমণ্ডলের ধ্বনির মাধ্যমে যে শব্দ উচ্চারিত হয়েছে তা বিশেষ বিষয়বস্তু সম্বলিত এবং তা বক্তা বলার জন্য যা কিছু ইচ্ছা করেছেন সেই ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

খ. বক্তব্যের সাথে কর্ম : কথা ও বক্তব্যে সাথে সাথে এই কথার সাথে সম্পর্কিত কোনকাজ সম্পাদিত হয় তাহলে তাকে বক্তব্য ও কথার সাথেব সংশ্লিষ্ট কর্ম বলা হয়। উদাহরণসরূপ কোন ব্যক্তির কথা বলার পাশাপাশি ঐ শ্রতাদেরকে হয় সাবধান করে অথবা সুসংবাদ দান করে। বক্তব্যে সাথে কর্ম ও বক্তব্য সংক্রান্ত কর্ম একই না; কেননা বক্তব্যে সাথে কর্ম, বক্তব্য সংক্রান্ত কর্মে বাইরে অন্য বিষয়ে সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। উদাহরণসরূপ হাত নাড়ানো এবং অন্য কোন কিছু নাড়ানোর মাধ্যমে কাউকে সর্তক করা। তবে কথা ও বক্তব্যে সাথে সাথে যে কোন কাজ করাকে বক্তব্যের সাথে কর্ম বলা হবে না; বরং বক্তব্যে সাথে ঐ কাজকে বলা হবে যা বক্তার বক্তব্যকে দূত অনুধান এবং শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করে থাকে। এ কারণে কোন বক্তব্যে সাথে কোন কর্ম বিষয়বস্তু ভাল অনুধাবনে সাহায্য করে[৩৮]।

গ. বক্তব্যের পর কর্ম : এমন এক ধরনের কর্মকে বুঝায় যা বক্তব্যে সাথে সম্পাদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বক্তব্যের পর কর্ম হল বক্তব্য সংক্রান্ত কর্মের ফল যা শ্রতাদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এবংএর ফলে তাকে সন্তুষ্ট করেছে এবং ভিত অথবা আশ্চর্যজনক করেছে।

এ মতটি কোরআন এবং ওহী সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উপর বিশ্বাস করে। প্রথমতঃ কোরআনের ওহীর ভাষার প্রকৃতি রয়েছে এবং বিশেষ ভাষার গঠন অনুসরণ করে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তায়ালা এ ভাষার ক্ষেত্রে বক্তব্য সংক্রান্ত কর্ম সম্পাদন করেছে। আল্লাহ অর্থযুক্ত বাক্যকে বিশেষ ভাষাতে রাসূল (সা.)-কে প্রকাশ করেছেন এবং এ বাক্যগুলো বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পন্ন ছিল[৩৯]। এ মত অনুসারে বক্তব্য সংক্রান্ত ওহী চারটি মূল বিষয়ের অধিকারী।

১. বক্তা (আল্লাহ)।
২. শ্রতা (রাসূল সা.)।

---

৩৮. কায়েমীনীয়, ১৩৮১ ঃ ৭২-৭৩।
৩৯. প্রাগুক্ত, ৭৪।

৩. বক্তব্য সংক্রান্ত কর্ম (বিশেষ ভাষার গঠন)।
৪. বক্তব্যের সাথে কর্ম (ওহীর বাণী)।

বক্তব্যে পর কর্ম অর্থাৎ বক্তব্যে প্রভাব ওহীর মূল বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা প্রথমতঃ বক্তব্যের পর কর্ম না কোন বাক্যর অন্তর্ভুক্ত, না এর সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয়; তিন ধরনের কর্মের প্রথম ও দ্বিতীয় এর বিপরীতে বাক্যের অন্তর্ভক্ত। তৃতীয়তঃ এ ফলাফল হল বক্তব্যের পর কর্ম মূল বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্ত হবে না। আল্লাহ তায়ালা এ শব্দগুলো এবং এর গঠন প্রকৃতিকে আরবী ভাষায় রাসূল (সা.)-কে নাযিল করেছেন এবং এ থেকে বিশেষ অর্থ ও বিষয়বস্তু ইচ্ছা পোষন করেছেন। এ কারণে শব্দ ও বাক্য উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিল এবং রাসূল (সা.) একে একইভাবে প্রচার করেছেন। এ দিক থেকে এর শব্দগুলোর অন্যভাষায় একই বিষয়বস্তু সহকারেতরজমা ওহী হিসাব হবে না; বরং ওহী আরবী ভাষায় হিসাব করা হবে[৪০]।

কোরআনের গঠন

শিয়া ও সুন্নী আলেমদের মাঝে বিতর্কিত বিষয় থাকা সত্তেও কিভাবে বর্তমানে প্রচলিত কোরআনের আয়াতগুলোর একে অপরের সাথের বিন্যাস ও সূরা উৎপত্তি এবং এগুলো বর্তমান শৃংখলার আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হওয়ার বিষয়ের মত গ্রহণ করা সম্ভব।

যখন রাসূল (সা.) কোরআনের আয়াত মানুষের মাঝে পড়তেন ওহীর লেখকরা তা লিপিবদ্ধ করতেন। কিন্তু কোরআনের সংকলনকখন হয়েছিল? এ গন্থটি যা কোরআন নামে আমাদের হাতে এসেছে কোন সময় উৎপত্তি ঘটেছিল?এ সম্পর্কে তিনটি ভিন্ন মত রয়েছে,

১. কোরআন রাসূল (সা.)-এর সময় তার নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ঐশী হিদায়াতের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। যদিও রাসূল (সা.) নিজে ব্যক্তিগতভাবে তা লিপিবদ্ধ এবং সংকলনের কাজ করে নাই[৪১]।

৪০. কায়েমীনীয়, ১৩৮১ ঃ ৭৭।
৪১. তালেকানী, ১৩৬১ ঃ ১, ৮৩।

২. বর্তমান কোরআনকে আলী (আ.) রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর পর সংকলন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন।এ কাজটি তিনি যখন গৃহে অবস্থানকারী, অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন তখন করেছেন[৪২]।

৩. কোরআনকে আলী (আ.) ব্যতিত অন্য সাহাবীরা রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর পর সংকলন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন[৪৩]। এ মতটি অধিকাংশ সুন্নী মাযহাবের মত হিসেবে প্রতিষ্টিত। এ ছাড়াও প্রাচ্যের কোরআন গবেষকরা এ মতটি দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। আধিকাংশ শিয়া আলেমরা বিশেষকরে বর্তমান আলেম এবং গবেষকরা বিশ্বাস করে যে কোরআন রাসূল (সা.) জীবদ্দশায় তার নিজস্ব তত্তাবধানে সংকলিত হয়েছে[৪৪]। কোন কোন শিয়া আলেমদের মতে দ্বিতীয় মতকে গ্রহণ করেছেন[৪৫]।

যেভাবে বিষয়টি স্পষ্ট যে প্রথম ও দ্বিতীয় মত অনুসারে কোরআনের সংকলনের সাথে আল্লাহর সম্পৃক্ততার রয়েছে এবং সূরা এবং এর ধারাবহিকতা ওহীর ছায়ায় সৃষ্টি হয়েছে; কারণ রাসূল (সা.) সূরা নাজ্‌ম এর ২ ও ৩ নম্বর আয়াত অনুসারে বিশেষকরে ধর্মীয় বিষয়ে যা কিছু বলে ওহীর নির্দেশ অনুসারে ছিল এবং ইমমা (আ.)-রা তার পথের ধারাবাহিকতা দানকারী। তার পথে নির্দেশদানকারী হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও পকিত্র এবং ঐশী জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন।

এ উল্লিখিত সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে এ সুস্পষ্ট সিধান্তে আসতে পারি, শব্দ ও বাক্য এবং কোরআনের বাহ্যিক গঠন যা উচ্চ ও গভির বিষয়বস্তু ও আলোকিত জ্ঞান আল্লাহর ওহীর অন্তর্ভক্ত। যা ওহী নাযিলকারী ফেরেশতা এবং রাসূল (সা.)-এর মধ্য দিয়ে কোন ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই অতিক্রম করে মানুষের হাতে এসে পৌঁছেছে। যা কিছু কোরআন নামে নাযিল হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের নিকট দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং মানবজাতি সবসময় এক আলোকিত দানের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে, এর শব্দে এমনকি প্রত্যেকটি বর্ণ আল্লাহর ওহী। সকল মানবজাতি সকল সময় এর কোন না কোন ভাবে শ্রোতা হিসেবে থাকবে।

---

৪২. নায়েনী, ১৩৮৪ ঃ ৮৭।
৪৩. নায়েনী, ১৩৮৪ ঃ ১৯ ও ৫১।
৪৪. তালেকানী, ১৩৬১ ঃ ১, ৮৩; মীলানী, ১৪১০ ঃ ৭৫ ও ৭৮; মারেফাত, ১৪১৩ ঃ ৩৪।
৪৫. জালালী নায়েবী, ১৩৮৪ ঃ ৮০।

ওহী এবং ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন

সমসাময়িক কোন কোন লেখক ওহীকে রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিগত ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের সাথে তুলনা করেছেন। তাদের মতে রাসূল (সা.) আল্লাহর সম্মুখীন হয়েছেন এবং মুখোমুখী হওয়ার যা কিছু অর্জন করেছেন এর তাফসীর আমাদের জন্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ওহীর বার্তা হল রাসূল (সা.) আত্মিক অভিজ্ঞতা যা তাফসীর আকারে অন্যের নিকট স্থানান্তর করেছে। এ কারণে আল্লাহ সাথে রাসূল (সা.) এর কোন তথ্য অথবা শব্দ-বাক্য আদান-প্রদান হয় নাই[৪৬]। তারা ওহীর ক্ষেত্রে পুরোনা আদর্শকে বাদ দিয়ে ধর্মীয় আত্মিক আভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের মতে কাছাকাছি হতে গুরুত্ব প্রদান করে[৪৭]।

অন্য আরেক ইসলামী চিন্তাবিদ ওহীকে ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনে মতে বিশ্বাস করতো তিনি হলেন ইকবাল লাহরী। যদিও তিনি সরারসরি এ সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই; কিন্তু ওহী হল আত্মিক অভিজ্ঞতা, এমতের বিশ্বাসী উইলিয়াম জেম্‌সের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েধর্ম ও ওহী ক্ষেত্রেএভাবে চিন্তা করতেন[৪৮]।এ মতটি ইতিহাসের দৃষ্টিতে ষোলতম শতাব্দির ধর্মীয় সংস্কারবাদী মার্টিন লুথার[৪৯] এবং জন কেলভীন[৫০] থেকে আসা এমনকি এর পূর্বে খ্রিষ্টান সময়ে তাদের প্রথম উপসনা গৃহ, গীর্জা থেকে আসা[৫১]।খ্রিষ্টান কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে অধিকাংশ উদারপন্থীকালাম শাস্ত্রবিদরা ওহীকে ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন মনে করতেন। তারা মনে করতো ওহীকে মানুষের অন্তরে এবং তার ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতায় এবং অনুধাবনে অনুন্ধন করতে হবে। খ্রিষ্টানদের পবিত্র বাইবেলে ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন বিষয়ে বর্ণনা এসেছে। গীর্জার প্রাতিষ্ঠানিক মত অনুসারেআল্লাহর ওহীহল মানুষের কাছে বাস্তবতারএক ধরনের স্থানান্তর করাকে বলা হয়। উদারপন্থী কালাম শাস্ত্রবিদরা প্রাতিষ্ঠানিক মতে বিপরীতে ওহীকে কোন

৪৬. সুরুশ, ১৩৭৭ ঃ ১১; ১৩৭২ ঃ ২৯; ১৩৭৯ ঃ ১৩২, ১৩৪, ১৬৯, ১৭৩।
৪৭. মুজতাহেদ শাবেস্তারী, ১৩৭৯ ঃ ৪০৫।
৪৮. মা'রুফ, ১৩৮২ ঃ ১৩৬; ইকবালে লাহরী, তারিখ অনুল্লিখিত ঃ ১৪৩।
৪৯. Martin Luther.
৫০. John Calvin.
৫১. আয়ান বারবূর, ১৩৭৪ ঃ ৬২।

বাস্তবতার স্থানান্তর করাকে নয়, বরং এক ধরনের আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের স্থানান্তরকে বলা হয়।

এ শ্রেণীর কালাম শাস্ত্রবিদরা এ মত উত্থাপনের মাধ্যমে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কিছু সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন; কেননা যদি ওহী ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের শ্রেণীর হয় এবং ধর্ম ও দর্শনের থেকে স্বতন্ত্র হয় তাহলে এর প্রমাণের জন্য দার্শনিক ও কালাম সংক্রান্ত কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হবে না। নিজেই নিজস্ব মর্যাদার অধিকারী হবে। এর মাধ্যমে পরীক্ষামূলক জ্ঞান ও ধর্মের সাথে বিপরীত সম্পর্কের পরিসম্পাতি ঘটবে; কেননা পরীক্ষামূলক জ্ঞানের সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক সম্পর্ক সৃষ্টিরসম্ভাবনা রয়েছে।এমতাবস্থায় যখন ওহী যা আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন এর সব অংশই ধর্মের অংশ না বরং তা বাইরের ও প্রান্তের কোন অংশ। খ্রিষ্টানদের পবিত্র গ্রন্থের সমালোচনা এ ধর্মের এবং ধার্মিকদের কোন প্রভবিত করে না; কেননাইঞ্জিল শরিফ এর বাক্যসমূহ এবং তাফসীরসমূহ ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন[৫২]।

আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনে ওহী তিনটি মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ, রাসূল (সা.)এবং রাসূল (সা.)-এর ওহীর আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন যা আল্লাহর সাথে সম্মুখীনের মাধ্যমে অর্জিত হয়; আল্লাহ রাসূল (সা.)-এর আত্মিক অভিজ্ঞতায় প্রকাশ পেয়েছে। ওহী এই অনুধানে ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা একই বিষয়।

আত্মিক অভিজ্ঞতার ওহী দুই অর্থে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথমতঃ একমাত্র রাসূল (সা.) অধিকার রয়েছে তার ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করবে এবং সকল আত্মিক অভিজ্ঞতারব্যক্তিগত আত্মিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভক্ত। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র রাসূল (সা.) এ ধরনের আত্মিক অভিজ্ঞতা থাকতে পারবে[৫৩]। এ মতটি একদিক থেকে ওহীর বার্তার সাথে মিল রয়েছে আর তা হল এ দুটি মতই ওহীকে ব্যক্তিগত আত্মিক অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ দুটি মতের পার্থক্য হলপ্রথম মত অনুসারে ওহী হল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বার্তা যার বিশেষ অর্থ ও বিষয়বস্তু রয়েছে এবং প্রাপ্ত বার্তা ওহীর আত্মিক অভিজ্ঞতার সহকারে হয়ে থাকেকিন্তু আত্মিক অভিজ্ঞতা ও আনুধাবনের ওহী , ওহী হল এই আত্মিক অভি্জ্ঞতার সমষ্টি

৫২. কায়েমীনীয়, ১৩৮১ (ক) ঃ ৫৮।
৫৩. কায়েমীনীয়, ১৩৮১ (ক) ঃ ৫৮।

এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বার্তা গ্রহণ করে না। এ কারণে ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞত ও অনুধাবনের সাথে আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের ওহীর কোন পার্থক্য নাই। কেননা দ্বিতীয় অর্থের বিশেষ আত্মিক অভিজ্ঞতার কোন বিষয়বস্তুই থাকে না।

পর্যালোচনা

যে সকল ব্যক্তিরা উল্লিখিত মতটি গ্রহণ করেছেন ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতার প্রকৃত স্বরূপের বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানে না। এ কারণে এর সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই। ওহী এক ধরনের আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন বলেই শেষ করেছেন। এ মতের অনেকগুলো নিম্নলিখিত সমস্যা রয়েছে,

১. ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতার প্রথম সমস্যা হল পরিচিতিমূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর কোন মূল্য নাই। কেননা সকল আত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জনকারী ভুলক্রমে আল্লাহ স্থলে তা নিজের সত্তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভুল করতে পারে । পরিচিতিমূলক জ্ঞানের দিক থেকে এর ধরনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা সম্ভব না; কেননা এ দাবির প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ মাপকাঠি নাই।

   অন্য ভাষায় ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা এক ধরনের অনুভূতি ও উপস্থিত জ্ঞান। উপস্থিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মনজগত সব সময় সয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত উপস্থিত জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত বিষয় থেকে ছবি তুলে এবং এ থেকে বিশেষ বিষয়বস্তু ও ভাব এবং অর্থ গ্রহণ করে; এরপর এ বিষয়বস্তু ও ভাবকে বিশেষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। এ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২. ওহীর সাথে ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতারআরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল এ মতটি রাসূল (সা.) প্রেরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ হিকমত ও প্রজ্ঞার পরিপন্থী; কেননা নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্য হল মানবজাতিতে সৌভাগ্য ও পূর্ণতার দিকে হেদায়াত করা। আল্লাহ এ উদ্দেশ্য তখনি পূর্ণ হবে যখন হেদায়াতকারী রাসূল (সা.) বাণীতে কোন ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।কেননা এ মতে কোন সাক্ষ-প্রমাণ নাই যে প্রেরক মানবজাতিকে সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করবে, না গোমরা ও পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে।স্বতঃসিদ্ধ এ রকম দুই ধরনের

সম্ভাবনার মধ্যে আল্লাহ মহান উদ্দেশ্য সফল হবে না; বরং তা ব্যর্থ হবে। এর ফলে রাসূল (সা.) প্রেরণের মূলনীতি বাস্তবায়িত হবে না। আল্লাহ পক্ষ থেকে এ ধরনের বেহুদা নির্দেশ অসম্ভব।

এখন ওহী রাসূল (সা.) এর সাথে আল্লাহর সম্পর্কের একমাত্র পথ হয়।তাযদি ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন হয় তাহলে তা মানুষের নিকট বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলবে। কেননা ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন পরিচিতিমূলক জ্ঞানের দিক থেকে কোন ধরনের মূল নাই। এর ফলে রাসূল (সা.) এর বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব না। এর কারণ হল ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতার মতের প্রবর্তকদের দৃষ্টিতে আত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জনকারীর বাণী হল ঐ অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

এ কারণে আল্লাহ নবী-রাসূল (সা.)-এর প্রেরণের উদ্দেশ্য তখনি সফল হবে যখন এতে কোন ধরনের ভুল হওয়ান সম্ভাবনা থাকবে না; কেননা মানুষ তাদের বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন নাকরা এবং হেদায়াত না পাওয়ার জন্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টিই যথেষ্ট।এ কারণে নবুয়্যতের বাহ্যিক দলিলের আলোচনার ক্ষেত্রে নিষ্পাপের বিয়ষটি নবীদের জন্য প্রমাণ করা হয়। অন্যদিকে কোরআন অনেক গুরুত্ব সহকারেঅনেকগুলো আয়াতে ঘোষণা করেছে যে কোরআন রাসূল (সা.) ব্যক্তিগত শব্দ দ্বারা গঠিত হয় নাই; অর্থাৎ কোরআন রাসূল (সা.) ব্যক্তিগত আত্মিক অনুধাবনের ব্যাখ্যা দ্বারা সৃষ্টি শব্দ থেকে উৎপত্তি ঘটে নাই; বরংকোরআনের শব্দও আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতার মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর অন্তরে নাযিল হয়েছে। যারা দাবি করে কোরআন রাসূর (সা.)-এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতারা আসলে কোরআনের মত নিয়ে আসতে চায়(যা কোরআনে অনুরূপ আনার চ্যলেঞ্জ সাথে মোকাবেলা করার অনুরূপ)।

এ বিষয়টির দিকে লক্ষ করলে উপরের প্রর্যালোচনাটি সত্যায়ন করা সম্ভব। আত্মিক অভিজ্ঞতা হল অর্জিত একটি বিষয় যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে। যদিও আল্লাহর ওহী অনর্জিত একটি বিষয়। ওহীর বিষয়ে ভুল চিন্তা করা সম্ভব না; ভুল হওয়ার সম্ভাবনা হলে এর মূল্যমান ও গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। স্বাভাবিকভাবে এর অবিশ্বাসের সম্ভাবনা নিয়েমানবজাতির

হেদায়াতের পথ অর্জিত হবে না। এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে না[৫৪]।

৩. আরেক দিক থেকে এ মতটি কোরআনের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। কোরআনের দৃষ্টিতে ওহীর প্রকৃত অবস্থা দিকে লক্ষ করলে এবং এর সাথে আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের পার্থক্য বিশ্লেষণে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। ঠিক যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছিল, পরিভাষায় ওহী হল আল্লাহর সাথে রাসূল (সা.) বিশেষ সম্পর্ককে বলা হয়; ওহী এক ধরনের আল্লাহ কালাম যা কোরআনের সূরা শুরা ৫১ নম্বর আয়াত অনুসারে তিন পদ্ধতির একটির মাধ্যমে রাসূল (সা.)-কে প্রেরণ করা হয়।

ক. সরাসরি নাযিল হওয়া ওহী ঃ এ পদ্ধতিতে ঐশী বাস্তবতা ও জ্ঞান সরাসরি রাসূল (সা.)-এর অন্তরে নাযিল হয় এবং এতে কোন ধরনের মাধ্যম ও পর্দা থাকে না। এ ধরনের ওহীর সাথে ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের এমন অবস্থায় কোন সম্পর্ক নাই যখন ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন শুধুমাত্র রাসূল (সা.) জন্য নির্দিষ্ট নয়।

খ. পর্দার অন্তরাল থেকে ধ্বনি সৃষ্টির মাধ্যমে ওহী ঃ এ ধরনের ওহীতে ঐশী জ্ঞান ধ্বনির মাধ্যমে কানে পৌঁছায় যা কোন বিশেষ বস্তু যেমন গাছ, পাথর এবং অন্যান্য কিছুতে সৃষ্টি হয়। এ ওহীর নাযীলের সময় কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় না; কিন্তু মনে হয় পর্দার অন্তরাল থেকে যেন কেউ কথা বলছে।

গ. ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরিত ওহী ঃ তৃতীয় পদ্ধতি হল আল্লাহ তায়ালা ঐশী জ্ঞানকে ফেরেশতা পাঠানোর মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর কর্ণে ও অন্তরে পাঠ করান।

আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন শ্রেণীর ওহী বর্ণনা করার পর সূরা শুরার ৫২ নম্বর আয়াতে বলেছেন এভাবে আমরা তোমার সাথে কথা বলেছি; কোন সময় মাধ্যম ছাড়া সরাসরি ও কোন সময় পর্দার অন্তরাল থেকে এবং কোন সময়ফেরেশতার মাধ্যমে। যা কিছু জিব্রাঈল আমীন এনেছিল রাসূল (জিব্রাঈল) পাঠানোর মাধ্যমে নাযিল হয়েছিল এবং ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরিত ওহীর অন্তর্ভুক্ত। শুয়ারা ১৯৩

৫৪. নাবাবীয়ন, রাওয়াকে আন্দীশে ঃ ৪৪।

ও ১৯৪ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যা কিছু রাসূল (সা.) সপ্ন এবং এর মত দেখতেন তা পর্দার অন্তরাল থেকে ধ্বনি সৃষ্টির মাধ্যমে ওহী শ্রেণীর অন্তর্ভক্ত। ঐ শ্রেণীর ওহী যা ঐশ্যরিক জ্ঞান থেকে সরাসরি নেওয়া হয়েছে তাকে ইলমে লাদুন্নী বলা হয় যা সূরা নামল এর ৬ নম্বর আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতটি নির্দেশ করে যে ওহীকে সরাসরি আল্লাহ জ্ঞান থেকে নেওয়া হয়েছে এবং কৃচ্ছ সাধনা বা অত্যাধিক প্রতিভার মাধ্যমে অর্জিত হয় নাই।

সূরা মুজ্জামেল এর ৫ নম্বর আয়াতে ওহীকে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করার বিষয়টি বুঝা যায় এবং তা রাসূল (সা.)-এর অন্তর থেকে উৎপত্তি লাভ করে নাই। একইভাবে সূরা হাক্কার ৪৩-৪৭ নম্বর আয়াতে ওহীর ঐশী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা এবং এর সব ধরনের বিকৃতি থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে।

একইভাবে সূরা আনকাবুতের ৪৭ ও ৪৮ নম্বর আয়াত এবং সূরা নাহলের ৮৯ নম্বর আয়াতে ওহীকে কিতাব আকারে বিশ্ব জগতের মানবজাতির জন্য রাসূল (সা.)-এর প্রতি নাযিল করেছেন। এ মতটি ওহীর আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের মতের সাথে মিলে না। এ কারণে ওহী রাসূল (সা.)-এর অন্তরের অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন হতে পারে না; বরং ঐশী বিষয় এবং বার্তা যা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন। এ কারণে ওহীর ক্ষেত্রে সমাজের ঘটনা যেমন কোন প্রভাব বিস্তার করে না; তেমনিভাবে এমনকি রাসূল (সা.)-ও ওহীর পরিবর্তনের ক্ষমতা এবং অনুমতি রাখেন না। অথচ ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে তা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সময় সাথে পরিবর্তনযোগ্য এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনাময়।

এ কারণে যারা ওহীকে রাসূলের ব্যক্তিগত ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন হিসাব করেছেন এবং যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করেছেন তারা এ মতের দাবির পক্ষে কোন বিশেষ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেন নাই। বরং তাদের এ দাবি ওহীর মিশন যেখানে পবিত্র দিকনির্দেশ রয়েছে তার সাথে এবং কোরআন যেভাবে ওহীকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এর সাথে মিলে না এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা বিষয়।

এছাড়াও কোরআনের শব্দ ও বাক্যে সাথে রাসূল (সা.)-এর শব্দ ও বাক্যের সাথে ব্যপক পার্থক্য রয়েছে। রাসূল (সা.)-এর শব্দ ও বাক্যের ধরণ যদিও সাধারণ ও নিষ্পাপ ব্যক্তি নয় এমন ব্যক্তিদের থেকে অনেক উর্ধ্বের কিন্তু তা ওহীর সমপর্যায়ের নয়। রাসূল (সা.) থেকে রয়ে যাওয়া বাণীগুলোকে কোরআনের সাথে তুলনা করলে দেখতে পাব যে এদের বর্ণনার পদ্ধতি, শব্দের সূর, বাক্যের গঠন এবং সার্বিক বিষয়ের সাথে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। এর ফলাফল হল ওহী ও কোরআন, রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিগত বাণী নয় এবং ওহীকে ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

৪. উল্লিখিত সমস্যা ছাড়াও এ মতটির আরো কিছু নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এখানে এগুলো সম্পর্কে ইশারা করা হল এবং এর বিস্তারিত আলোচনা অন্য কোথাও করা হবে। এই নেতিবাচক প্রভাব হল ওহীর ভাষাগত প্রকৃতিকে অস্বীকার করা, কোরআনের শব্দ ও বাক্যসমূহ ঐশী না হওয়া, ওহীর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা, নবুয়তের পরিসমাপ্তির বিষয়টি অস্বীকার, নবীর আত্মিক অভিজ্ঞতার ব্যপক প্রসার লাভের সম্ভাবনা, ওহী সবময়ের থেকে সীমিত রূপ লাভ করা এবং ধর্মের সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়া, ধর্ম থেকে ইবাদতের অংশ ছাড়া সবকিছু আলাদা হওয়া অর্থাৎ সেকুলারিজমের সৃষ্টি, কোরআনের ঐশী ও পবিত্রতার রক্ষা না হওয়া, কোরআন থেকে অর্জিত জ্ঞানের পবিত্রতার রক্ষা না পাওয়া, কোরআনের মূলনীতির বাহরে বিভিন্ন তাফসীরকারকদের অর্থ করার পথ উন্মোচন, ধর্ম থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থের অনুধাবনের সুযোগ, কোরআনের কোন নির্দিষ্ট মূলনীতি না থাকার বিষয় প্রমাণ, কোরআনের ওহীর পরিচিতি বিষয়টি অসম্ভব হওয়া উল্লেখযোগ্য।

ওহী এবং ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনকে একই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করার সমালোচনা এবং প্রভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এ দুটিকে এক করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর নির্ভর না করে আমাদেরকে বর্ণনামূলক দলীল এবং অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা করতে হবে। ঠিক এখানেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনামূলক দলিল ওহীর প্রকৃতির সাথে ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের প্রকৃতিকে মত আলাদা এবং ওহী আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিচয় করানো হয়েছে। এ কারণে ওহী এর বিষয়বস্তু, জ্ঞান, শব্দ ও বাক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল

(সা.)-এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং তিনি কোন পরিবর্তন ছাড়াই মানুষের মাঝে প্রচার করেছেন। আজকে কোরআন হিসেবে মানুষের হাতে রয়েছে তা আল্লাহ ওহী ছাড়া অন্য কিছুই নাই যা রাসূল (সা.)-কে নাযিল করা হয়েছে।

উপসংহার

যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে, ওহী অবস্তুগত একটি বিষয় এবং বিশেষ ধরনের পরিচিতি যা মানুষদের মধ্য হতে বিশেষ শ্রেণীর অর্জন করতে পারে। কোরআনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বিষয় হল ওহী রাসূল (সা.)-এর কোন বার্ণী, চিন্তা ও বিশেষ প্রতিভার কোন বিষয় না। বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে এ বিষয়ের পক্ষে অনেক পূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে।

আরেকটি বিষয় হল কোরআনের ওহী, ঐশী হওয়ার বিষয়ে অনেকগুলো মত রয়েছে। এদের মধ্যে একটি মত সঠিক। ঐ সঠিক মতটির মূল ভাষ্য হল কোরআনের উচ্চ ভাবার্থ ও জ্ঞান এবং একইভাবে এর শব্দ ও বাক্য সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে; রাসূল (সা.) আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ এবং কোন ধরনের শব্দগত ও বিষয়বস্তুগত পরিবর্তন ছাড়াই মানুষের মাঝে উপস্থাপন করেছেন।

ওহীর প্রকৃত স্বরূপের মতগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি মত হলবক্তব্য সংক্রান্ত কর্মের মত। এ মতটিও উল্লিখিত মতের মত বিশ্বাস করে যে কোরআনের উচ্চ বিষয়বস্তু ও জ্ঞান এবং এর শব্দ ও বাক্য সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে। ওহী হল আল্লাহর প্রেরিত বার্তার রাসূল (সা.)-এর বর্ণনার মত এবং ওহী হল রাসূল (সা.)-এর ধর্মীয় আত্মিক অভিজ্ঞতা ও অনুধাবন; এ দুটি মতের অনেক সমালোচনা এবং নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে যা এ প্রবন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে, ওহী ঐ অর্থে যা বলা হয়েছে, যার বিষয়বস্তু ও জ্ঞান এবং একইভাবে শব্দ, বাক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে; রাসূল (সা.)-ও কোন পরিবর্তন ছাড়াই মানুষের মাঝে প্রচার করেছেন। এ কারণে কোরআন রাসূল (সা.)-এর প্রতি নাযিল হওয়া ঐশী ওহীনামা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

(অনুবাদ : মো. রফিকুল ইসলাম)

তথ্যসূত্র

১. ইবনে খালদুন, আবদুর রাহমান, ১৪০০, **মুকাদ্দামাহ**, বৈরুত: দারুল কালাম।

২. ইবনে ফার্স, বিতা, **মু'জামুল মুকায়েসুল লোগাহ**, তাহকীকে আবদুস সালাম মুহাম্মাদ হারুন, কোম: দারুল কিতাবুল আলামিয়্যা।

৩. ইবনে মানযুর, ১৪০৫, **লিসানুল আরাব**, নাশরে আদাবুল হাওযা।

৪. ইবেন হিশাম, আবদুল মালিক, ১৩৫৯ হিজরী, **আস সীরাতুন নাবাভিয়্যা**, কায়রো: মাতবাআতুল মুসতাফাল বাবীল হালবী।

৫. আহমাদ আমীন, ১৯৬৫, **যুআমাউল ইসলাহ ফীল আসরেল হাদীস**, কায়রো: মাকতাবাতুল নাহযাতুল মিসরিয়্যা।

৬. ইকবাল লাহোরী, মুহাম্মাদ, বীতা, **এহইয়ায়ে ফেকরে দীনী দার ইসলাম**, তারজোমেয়ে আহমাদে আরাম, তেহরান: কেতাবে পায়া।

৭. **আলাসতুন (তাজরোবেয়ে দীনী এদরাকে খোদাওয়ান্দ আস্ত)** তারজোমেয়ে মালেক হোসেইনী, কিয়ানী শামসী ৫০।

৮. বারাবুর, আয়ান, ১৩৭৪, **ইলম ও দীন**, তারজোমেয়ে বাহাউদ্দীন খোর্রামশাহী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, তেহরান: মারকাযে নাশরে দানেশগাহী।

৯. **দায়োরাতুল মাআরেফে বুযুর্গে ইসলামী**, তেহরান: মারকাযে দায়োরাতুল মাআরেফে ইসলামী, ১৩৭০।

১০. পিটারসন, মাইকেল ও অন্যান্য, **আকল ও এতেকাদে দীনী**, তারজোমেয়ে আহমাদ নারাকী ও ইবরাহীমে সুলতানী, তারহে নো, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৭৯।

১১. প্রাউডফুট, ভীন, **তাজরোবেয়ে দীনী**, তারজোমেয়ে আব্বাস ইয়াযদানী, মুওয়াস্সেসেয়ে ফারহানগিয়ে তাহা, প্রথম মুদ্রণ, ১৩৭৭

১২. সামানী, সাইয়েদ মুসতাফা, ১৩৫২, **নাযারী বে উজুহে এ'জাযে কোরআন**, তাবরীয: দানেশকাদে আদাবিয়াত ও উলুমে ইনসানিয়ে দানেশগাহে তাবরীয।

১৩. জালালীয়ে নাইনী, সাইয়েদ মুহাম্মাদ রেযা, ১৩৮৪, **তারীখে জাময়ে কোরআনে কারীম**, তেহরান: সোখান।

১৪. আল্লামা হিল্লী, হাসান বিন ইউসুফ, ১৩৭২, **কাশফুল মুরাদ,** তৃতীয় মুদ্রণ, কোম, এনতেশারাতে শাকুরী।

১৫. খোমেইনী, সাইয়েদ মোস্তফা, ১৪১৮, **তাফসীরে কোরআনুল কারীম**, নাশরে আসারে ইমাম (র.)।

১৬. যাহাবী, মুহাম্মাদ হোসেইন, ১৪০৬, **আল ওয়াহী ওয়াল কোরআন**, মাকতাবাহ ওয়া হেবা।

১৭. যারকানী, আবদুল আযীম, বীতা, **মানাহিলুল ইরফান ফী উলুমুল কোরআন**, মিসর: দারে এহইয়াউল কিতাবুল আরাবিয়্যা।

১৮. যেরেশকী, বাদরুদ্দীন, ১৪০৮, **আল বুরহান ফী উলুমুল কোরআন**, বৈরুতঃ দারুল কিতাবুল আলামিয়্যা।

১৯. সুরুশ, আবদুল কারীম, ১৩৭৯, **বাস্তে তাজরোবেয়ে নাবাভী**, তেহরানঃ মুওয়াসসেসেয়ে ফারহানগিয়ে সীরাত।

২০. সুরুশ, আবদুল কারীম ও অন্যান্য, ১৩৮১, **সুন্নাত ও সেকুলারিযম**, তেহরানঃ মুওয়াস্সেসেয়ে ফারহানগিয়ে সীরাত।

২১. সুরুশ, আবদুল কারীম, ১৩৭৭, **সীরাতহায়ে মুসতাকীম**, তেহরানঃ মুওয়াস্সেসেয়ে ফারহানগিয়ে সীরাত।

২২. ----, ১৩৭২, **ফারবেতার আয ইডিউলুযী**, তেহরানঃ মুওয়াসসেসেয়ে ফারহানগিয়ে সীরাত।

২৩. ----, ১৩৭৫, **কাবয ও সাবতে তিওরিকে শারীয়াত**, ৫ম মুদ্রণ, তেহরানঃ মুওয়াসসেসেয়ে ফারহানগিয়ে সীরাত।

২৪. সুয়ুতী, জালালুদ্দীন, ১৪১১, **আল এতকান ফী উলুমুল কোরআন**, কোমঃ রাযী।

২৫. শাহরেস্তানী, মুহাম্মাদ বিন আবদুল কারীম, ১৩৬৮, **মাফাতীহুল আসরার ওয়া মাসাবিহুল আবরার**, তেহরানঃ নাশরে নোসখে খাত্তী।

২৬. তালেকানী, সাইয়্যেদ আব্দুল ওয়াহহাব, ১৩৬১, **উলুমুল কোরআন**, কোমঃ দারুল কোরআনুল কারীম।

২৭. তাবাতাবায়ী, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসেইন, ১৩৯১ হিজরী, **আল মীযান**, বৈরুতঃ মুয়াসসেসে আল আ'লামী লিল মাতবুআত।

২৮. তাবাতাবায়ী, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হোসেইন, ১৩৭৮, **শিয়া দার ইসলাম**, দাফতারে এনতেশারাতে ইসলামী, কোম, ১৩৭৮।

২৯. তাবারসী, ফাযল বিন হাসান, ১৪১৫, **মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরুল কোরআন**, আল তাহকীক লাজনাতু মিনাল মুহাক্কেকীন, বৈরুতঃ মুয়াসসেসে আল আ'লামী লিল মাতবুআত।

৩০. আবদেহ, মুহাম্মাদ, ১৩৫৮ হিজরী, **রিসালাতুত তাওহীদ**, তাবায়ে মিশর।

৩১. ফারাবী, আবু নাসর, বীতা, **অরায়ে আহলুল মাদীনাতুল ফাযিলা ওয়া মুযাদাতহা**, বৈরুতঃ মাতবায়ে মুহাম্মাদ আলী সাবীহ।

৩২. ফীরুযআবাদী, বীতা, **আল কামুসুল মুহীত**, বীজাঃ বীনা।

৩৩. ফিউমী, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ, ১৪০৫ হিজরী, **মিসবাহুল মুনীর**, কোমঃ দারুল হিজরাত।

৩৪. কায়েমী নিয়া, আলী রেযা, ১৩৮১ (আলিফ), **তাজরোবেয়ে দীন ওয়া গোওহারে দীন**, কোমঃ বুসতানে কিতাব, দাফতারে তাবলিগাতে ইসলামিয়ে হোওযেয়ে ইলমিয়ে কোম।

৩৫. ----, ১৩৮১ (বা), **ওয়াহী ওয়া আফআলে গুফতারী** (নাযারিয়েয়ে ওয়াহঈয়ে গুফতারী) আনজুমানে মাআরেফে ইসলামী (নাশরে যেলালে কাওসার)

৩৬. গাতিং, গ্রে, **তাকরিরিয়ে এসলাহ শুদে আয তাজরোবেয়ে দ্বীনী**, তারজোমেয়ে পারওয়ানেয়ে উরুজ নিয়া, নাক্‌দ ও নাযার, শুমোরেয়ে ২৩-২৪, ১৩৭৯।

৩৭. মুজতাহিদ শাবেসতারী, মুহাম্মাদ, ১৩৭৯, **নাকদী বার কারাআতে রাসমী আয দীন বোহরানহা**, চালেশহা, রাহেহালহা), তেহরান: তারহে নো।

৩৮. মাজলেসী, মুহাম্মাদ বাকের, ১৪০৩ হিজরী, **বিহারুল আনওয়ার**, বৈরুত: আল মুআসসেসাতুল ওয়াফা, আত তেবআতুস সানিয়া, ১৪০৬ হিজরী।

৩৯. মোতাহহারী, মোরতাযা, ১৩৫৯, **পায়ামবারে উম্মী বে যামীমেয়ে খাতমে নাবুওয়াত**, দাফতারে এনতেশারাতে ইসলামী।

৪০. ----, ১৩৭৮. **মাজমুয়েয়ে আসার**, খ. ৪, মু. ৫, এনতেশারাতে সাদারাপ।

৪১. মারেফাত, মুহাম্মাদ হাদী, ১৪১৭, **আত তামহীদ ফী উলুমুল কোরআন**, দাফতারে এনতেশারাতে ইসলামী।

৪২. ----, ১৪১৩, **সিয়ানাতুল কোরআন মিনাত তাহরীফ**, কোম: দাফতারে এনতেশারাতে ইসলামী।

৪৩. মা'রুফ, মুহাম্মাদ, ১৩৮২, **একবাল ও আনদীশেহায়ে দীনীয়ে গার**ব, তারজোমেয়ে মুহাম্মাদ বাকাঈ, এনতেশারাতে কাসিদে সারা।

৪৪. মুর, এ. ডাব্লিউ, ১৩৮৩, (ফালসাফে মানতেক) **নেগারেশহায়ে নাভীন দার ফালসাফে**, তারজোমেয়ে আলী রেযা কায়েমী নিয়া, খ.২, মু.৩, কিতাবে তাহা।

৪৫. মিলানী, সাইয়েদ আলী, ১৪১০, **আত তাহকীক ফী নাফীত তাহরীফ আনিল কোরআনিশ শারীফ**, কোম: দারুল কোরআনুল কারীম।

৪৬. হাদাভীয়ে তেহরানী, মাহদী, ১৩৭৭, **মাবানীয়ে কালামীয়ে ইজতেহাদ দার বারদশ্‌ত আয কোরআন**, মুআসসেসেয়ে ফারহানগিয়ে খনেয়ে খেরাদ।

৪৭. হিনদী, সাইয়েদ আহমাদ খান, ১৩৩৪, **তাফসীরুল কোরআন ওয়া হুওয়াল হুদা ওয়াল ফুরকান**, তারজোমেয়ে সাইয়েদ মুহাম্মাদ তাকী ফাখর দাঈ গিলানী, মু.২, তেহরান: চপখনেয়ে অফতব।

প্রবন্ধ

১. আবু যেইদ, নাসরে হামেদ, **মাফহুমে পুশিদে ও মুবহামে ওয়াহী**, তারজোমেয়ে মুহাম্মাদ তাকী কারামী, নাকদ ও নাযারে শুমোরেয়ে ১২।

২. ইবুয়ান, সাইয়েদ মাহমুদ, **হাকীকাতে ওহী ও তাজরোবেয়ে দ্বীনী**, রাওয়াকে আনদিশে, শিন ১।

মানবতাবাদ

আয়াতুল্লাহ মাহমুদ রাজাবী

মানুষ সম্পর্কে অস্তিত্বগতভাবে ও মূল্যবোধের দৃষ্টিতে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারা বিদ্যমান রয়েছে। কোন কোন মনীষী মানুষকে অন্য সকল কিছু থেকে উন্নত এক অস্তিত্ব, অনেকে মানুষকে প্রাণীদের সমকক্ষ আবার কেউ কেউ মানুষকে অন্য প্রাণী থেকেও নিম্নতর দুর্বল এক অস্তিত্ব জ্ঞান করেছেন। মানুষের মর্যাদার দৃষ্টিতেও একদল তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, একদল তাকে ভাল বা মন্দ কোন বৈশিষ্ট্য শূন্য বন্ধা এক সত্তা এবং অন্য একদল তাকে মূল্যহীন নিকৃষ্ট প্রকৃতির এক সত্তা গণ্য করেছেন।

মানুষের প্রকৃত সত্তা কি এবং তার মধ্যে কি ধরনের শক্তি ও যোগ্যতা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে যে সম্পর্কেও বিপরীতমুখী দুটি দৃষ্টি ভঙ্গি প্রচলিত আছে।

প্রথম দৃষ্টি ভঙ্গিতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও স্বনির্ভর এক সত্তা যে তার প্রকৃত সাফল্য ও সৌভাগ্য কি নিজে নিজেই জানতে সক্ষম এবং ঐ সাফল্যে পৌঁছার পথও সে নিজেই নির্ধারণ ও রূপদান করতে সক্ষম। আর তাই সে নিজেই তার ভাগ্যকে চিত্রিত করে। এ দৃষ্টিতে সে স্বাধীন এক অস্তিত্ব হিসেবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। ফলে বাইরে থেকে কেউই তার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার বা তার জন্য পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই এবং সে নিজেই সকল কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

দ্বিতীয় দৃষ্টি ভঙ্গি অনুযায়ী যদিও মানুষ নিজের সৌভাগ্য ও সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সম্পর্কে মোটামুটিভাবে অবহিত কিন্তু তা তার জন্য যথেষ্ট নয় বরং এ ক্ষেত্রে সে ঐশী পথ নির্দেশনার মুখাপেক্ষী। এ কারণে স্বীয় সাফল্যে পৌঁছার জন্য তার ঐশী পরিচালনার অধীনে থাকা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের মাধ্যমে তাদের প্রতি আবশ্যিক যে দায়িত্বমালা অর্পণ করা হয়েছে তা পালনের প্রয়োজন রয়েছে।

মানবেতিহাসের শুরু থেকেই এ দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মানব সমাজে বিদ্যমান ছিল এবং এখনও রয়েছে। তবে কখনও বা কোন সমাজে এ দুটির কোনটির তীব্রতা বেশী

আবার কোনটির কম ছিল। তবে নিঃসন্দেহ বলা যায় ইউরোপে রেনেসাঁর পর থেকে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটিকে তাত্ত্বিক রূপ দান করে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর সর্বোচ্চ প্রয়োগের চেষ্টা শুরু হয় এবং বিগত ছয় শতাব্দীর চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর এ চিন্তাধারা এতটা প্রভাব বিস্তার করেছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অচেতনভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তাকেও এদিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।

মানবতাবাদের অর্থ ও সংজ্ঞা

মানবতাবাদ সম্পর্কিত ধারণা ও এর অর্থের ক্ষেত্রে যদিও গবেষক ও মনীষীগণ এ শব্দটির উৎস উদঘাটন এবং এর পারিভাষিক অর্থ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ দৃষ্টি ভঙ্গি ও মত প্রকাশ করেছেন এবং স্বীয় মতের সপক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ শব্দটির ঐতিহাসিক উৎস ও অভিধানিক অর্থ জানার বিষয়টি মূল আলোচনায় তেমন কোন প্রভাব রাখে না। এ কারণে আমরা কেবল এ চিন্তাধারার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব। সাধারণত 'মানবতাবাদ' শব্দটি এমন দার্শনিক চিন্তা ও ধারণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যা মানুষের বিশেষ মর্যাদায় বিশ্বাস করে এবং মানুষকে সকল কিছুর কেন্দ্র ও মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করে থাকে।

ঐতিহাসিকভাবে মানবতাবাদের ধারণাটি প্রথমে একটি সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, চিন্তাগত ও শিক্ষা ভিত্তিক আন্দোলন হিসেবে বিদ্যমান ছিল যা পরবর্তীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এ কারণেই এ চিন্তাধারা সকল দার্শনিক, নৈতিক, শৈল্পিক ও সাহিত্যিক বিষয়কে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। ইউরোপের সকল মতবাদ সচেতন বা অসচেতনভাবে এ চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কমিউনিজম, উপযোগবাদ, অধ্যাত্মবাদ, অস্তিত্ববাদ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, উদারতাবাদ, এমনকি মার্টিন লুথারের সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী (প্রোটেস্টানিজম) ধারাসহ ইউরোপের সকল মতবাদ ও চিন্তাধারাই মানবতাবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। যদিও এ চিন্তাধারার বীজ প্রাচীন রোমান ও গ্রীক চিন্তাধারায় ছিল, কিন্তু প্রথমবারের মতো ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে রেনেসাঁর বেশ কিছু পূর্বে ইটালীর উচ্চ শ্রেণির একদল লোকের মধ্যে এ চিন্তাধারা একটি আন্দোলন রূপে প্রকাশিত হয়। অতঃপর তা সমগ্র ইটালীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে পার্শ্ববর্তী

রাষ্ট্রসমূহে, যেমন জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, এমনকি ইংল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছায়। এটিকে পাশ্চাত্যের নব্য সংস্কৃতির উদ্ভবের কারণ বলা যেতে পারে।

সুতরাং এ অর্থে মানবতাবাদ রেনেসাঁর অন্যতম ভিত্তিস্বরূপ এবং রেনেসাঁকালীন চিন্তাবিদরা মানুষকে ব্যাখ্যার জন্য মানুষকেই মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এভাবে প্রকৃতি জগৎ ও ইতিহাসে তাকে নতুন রূপে গঠনের প্রয়াস চালান। যেমনটি উপরে বলা হয়েছে, মানবতাবাদী চিন্তাধারার উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীসে। রেনেসাঁর যুগের মানবতাবাদী চিন্তাবিদরা 'প্রাচীন গ্রীস ও রোমে মানুষের মর্যাদা, শক্তি ও যোগ্যতার প্রতি যে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হতো, (মধ্যযুগে মানুষের প্রতি উপেক্ষা ও অমনোযোগ লক্ষ্য করে) তার পুনর্জাগরণের চেষ্টায় রত হলেন। তাঁরা ভাবলেন যে, অঙ্কশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, কবিতা, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতিসহ গ্রীস ও রোমে প্রচলিত সাহিত্য শিক্ষাদান ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে গতিশীল ও কর্মঠ এক অস্তিত্বে পরিণত করা যাবে যাতে সে তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাকে তার অভিজ্ঞতায় অর্জন করতে পারে।

মানবতাবাদের উৎপত্তির ক্ষেত্রসমূহ

যদিও মানবতাবাদের উৎপত্তির কারণ ও ক্ষেত্রসমূহের আলোচনা বেশ ব্যাপক, কিন্তু সংক্ষিপ্তভাবে এখানে দুটি প্রধান কারণের প্রতি ইশারা করা যায়।

একদিকে গির্জাভিত্তিক ধর্ম ব্যবস্থায় বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ, যেমন খ্রিস্টধর্মের দুর্বল বিশ্বাস ও মূল্যবোধসমূহ, ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়ে চিন্তাভাবনাকে নিষিদ্ধ করে অন্ধভাবে বিশ্বাসের ওপর গুরুত্বারোপ, মানুষের সত্তাগতভাবে পাপী হওয়ার বিশ্বাস, গির্জা কর্তৃক বেহেশত কেনা-বেচা, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে খ্রিস্টবাদের বিরোধিতা, গির্জা কর্তৃক বুদ্ধিবৃত্তির পরিপন্থী শিক্ষাকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ধর্মবিরোধী হওয়ার অজুহাতে প্রত্যাখ্যান ও দমন ইত্যাদি বিষয়গুলো ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা ও শাসক গোষ্ঠী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং প্রাচীন রোম ও গ্রীসের চিন্তাধারাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। কারণ, এ আদর্শটি মানুষকে বিশেষ মর্যাদা ও তার বুদ্ধিবৃত্তিকে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করত। অপর দিকে মানবতাবাদী চিন্তাধারার শীর্ষস্থানীয়দের অনেকেই ক্ষমতার অধিকারীদের সাথে সম্পর্ক রাখত এবং ধর্মকে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার পথে শক্তিশালী প্রতিবন্ধক বলে গণ্য করত। এ ধারা দূর করার জন্য তারা একদিকে রাজনৈতিক পট

পরিবর্তন ও আধুনিকতাবাদকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ব্যাখ্যা দান এবং এর নেতিবাচক দিকগুলোকে ঢেকে রাখার প্রয়াস চালায়। অন্যদিকে ধর্ম, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নিদর্শনসমূহ এবং গির্জাকেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে আক্রমণাত্মক প্রশ্নের সম্মুখীন করে সমাজের সদস্যদের ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে যাতে তারা ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

এ দুটি কারণ ধর্মকে সমাজ ও রাজনীতির ময়দান থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য করে। ফলশ্রুতিতে ধর্ম ও খোদা সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা যা খোদাকে (সীমিত পরিসরে) গ্রহণ করলেও খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় বিধিবিধানকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান অথবা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখায় পর্যবসিত হয়। সেই সাথে ধর্মীয় বহুত্ববাদ (সকল ধর্মকে আংশিক সঠিক বলে গ্রহণ), সকল ধর্মের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের বিষয়সমূহকে সমপর্যায়ে গণ্য করে প্রত্যেকের প্রতিই সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ, ধর্মকে সংশোধিত ও সংস্কারের মাধ্যমে যুগোপযোগীকরণ (যেমনটি প্রোটেস্ট্যান্টরা করেছে) এবং ধর্মীয় পাঠ্যকে বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ হিসেবে উপস্থাপন আধুনিকতাবাদকে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করে।

মানবতাবাদের উপাদানসমূহ ও ফলাফল

মানবতাবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা থাকলেও যে সাধারণ ও মৌলিক দিকটি এর সব ধারার মধ্যেই কেন্দ্র হিসাবে বিদ্যমান, তা হলো মানুষকে সকল কিছুর ভিত্তি ও মাপকাঠি বলে গণ্য করা। যদি আমরা শুধু এ কেন্দ্রীয় দিকটিরই গঠনকারী বিভিন্ন উপাদান এবং আনুষঙ্গিক অবিচ্ছেদ্য যৌক্তিক পরিণতিকে বিবেচনায় আনি, তবে তা মানবতাবাদীদের থেকে বিবৃত সকল উক্তির সারকে মোটামুটিভাবে বর্ণনা করে বলা যায়। আমরা এখানে এরূপ চারটি দিক ও বিষয়কে উপস্থাপন করছি :

বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতাবাদ

মানবতাবাদের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো আত্ম ও বিশ্বপরিচিতি অর্জন এবং মানুষের প্রকৃত সৌভাগ্য ও সফলতা নির্ণয়ে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বাধীন, স্বনির্ভর ও যথেষ্ট বলে মনে করা।

মানবতাবাদীরা জ্ঞান ও পরিচিতির ক্ষেত্রে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, বিশ্বে এমন কোন বিষয় নেই যা মানুষ তার বুদ্ধি দ্বারা উদ্‌ঘাটন ও বুঝতে সক্ষম নয়। এ কারণেই তারা অস্তিত্ব জগতের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তু-ঊর্ধ্ব সকল কিছুর–যেমন : স্রষ্টা, ওহী, পরকাল, অলৌকিকতা ইত্যাদি–অস্তিত্বকে অস্বীকার ও অপ্রামাণ্য গণ্য করেছে। অধিকার নির্ধারণ ও আইন প্রনয়ণের ক্ষেত্রেও তারা কেবল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর করে থাকে। মানবতাবাদ যেহেতু ইউরোপে প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম ও এর প্রবর্তিত বিধিবিধানের সনাতন ধারার বিপরীতে গঠিত একটি আন্দোলন, সেহেতু তা ধর্মকে তাদের চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধক গণ্য করত। তারা মানুষের মর্যাদা ও পরিচয়ের ক্ষেত্রে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে যাতে মানুষ স্রষ্টা-প্রত্যাশী ও স্রষ্টামুখী এক অস্তিত্বের পরিবর্তে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকেন্দ্রিক ও আত্মনির্ভর এক অস্তিত্ব হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয় যা বিজ্ঞাননির্ভরতা ও বিজ্ঞানমুখিতার জন্মদান করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মানবতাবাদীদের মধ্যে ডেভিড হিউমসহ অনেকেই এরূপ বিশ্বাস করতেন যে, এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নেই যার জবাব বিজ্ঞানভিত্তিক মানবিক জ্ঞানে নেই। এ বুদ্ধিবৃত্তিকতা ও ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞাননির্ভরতা এতটা ব্যাপকতা লাভ করে যে, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার গণ্ডিতেও প্রবেশ করে। ফলে তাঁরা এরূপ বিশ্বাস পোষণ শুরু করেন যে, নৈতিক মূলনীতিসমূহও মানুষের তৈরি এবং এটাই হওয়া উচিত।

ওয়াল্টার লিপম্যান (A Preface to Morals) গ্রন্থে বলেন : 'মানুষ নৈতিক নীতিমালা ও মানদণ্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের (ঐতিহাসিক) অভিজ্ঞতার প্রতি মুখাপেক্ষী এবং তার উচিত... এমন ধারণা নিয়ে জীবন যাপন করা যে, মানুষের এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে, তার চিন্তা ও সিদ্ধান্তকে খোদার সিদ্ধান্তের অনুগত ও তার সাথে সমঞ্জস্যশীল করতে হবে; বরং মানুষ তার সৌভাগ্যের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পরিবেশ সম্পর্কে যে জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অর্জন করবে, নিজের চাওয়া-পাওয়াকে সে অনুযায়ী সাজাবে।

স্বাধীনতা ও মুক্তিকামিতা

মানবতাবাদীরা বিশ্বাস করে যে, মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন হিসেবে পৃথিবীতে এসেছে, আর তাই তার এই স্বাধীনতাকে যদি সীমাবদ্ধ করতেই হয়, তবে তা সে

নিজেই নির্ধারণ করবে। মধ্যযুগের সমাজ নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহ মানুষকে এমন কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক বিধিবিধানে বন্দি করেছিল যা মানুষের ঊর্ধ্বের এক কর্তৃপক্ষ থেকে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া একগুচ্ছ মূল্যবোধ ছিল। কিন্তু মানবতাবাদীরা এরূপ ঐশী মূল্যবোধ ও অবশ্যপালনীয় বিধানকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে। কারণ, এগুলো বাধ্যতামূলক কিছু প্রথা যা কোনভাবেই পরিবর্তনযোগ্য নয় বলে গণ্য। এ ধরনের বিষয় তাদের দৃষ্টিতে মানুষের স্বাধীনতার পরিপন্থী। তারা বলে : মানুষকে অবশ্যই প্রকৃত জগৎ ও সমাজে স্বাধীনতাকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে এবং নিজেই তার ভবিষ্যৎ ও ভাগ্য নির্ধারণ করবে। সুতরাং মানুষের ওপর কোন কর্তৃপক্ষই নেই, যে মানুষের অধিকার প্রণয়ন ও তার জন্য কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের কেবল অধিকার রয়েছে, কোন দায়িত্ব নেই।

ম্যাক্স হারম্যান (Max Herman), যিনি ব্যক্তি-কেন্দ্রিতার বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন; চরমপন্থী মতব্যক্ত করে বলেছেন : 'মানুষকে কখনই সামাজিক বিধিবিধানের অধীনে শৃঙ্খলিত ও নিয়ন্ত্রিত করা উচিত নয়। কেবল ক্ল্যাসিক সাহিত্যই মানুষের প্রকৃত সত্তাকে পূর্ণ চিন্তাগত ও নৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে প্রকাশ ঘটাতে পারে। কারণ, এ সাহিত্য মানুষকে স্বাধীনভাবে যে কোন চিন্তা, ধারণা ও বিশ্বাস পোষণের অনুমতি দেয় এবং নীতি ও আইনের বিষয়কে আপেক্ষিক, অস্থায়ী ও পরিবর্তনযোগ্য গণ্য করে। আর তাই সকল রাজনৈতিক, আইনগত ও নৈতিক বিধানকে অবশ্যই মানুষ ও তার (নিরঙ্কুশ) স্বাধীনতার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হতে হবে এবং কখনই এর পরিপন্থী নীতি গ্রহণ করা যাবে না। এ কারণেই মানবতাবাদীরা ধর্মীয় নীতিমালা ও মূল্যবোধগুলোকে আদৌ আবশ্যক বলে মনে করে না; বরং এ ধরনের বিষয়সমূহ তাদের দৃষ্টিতে মানবতাবাদের পরিপন্থী হিসেবে মধ্যযুগের সমাজ নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোর (অর্থাৎ গির্জাশাসিত, রাজা-প্রজার ধারণাভিত্তিক সমাজ, সামন্তবাদ এবং রাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ন্যায় অন্যান্য মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের) অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য এবং মূল্যহীন প্রতিপন্ন হয়।

পরমতসহিষ্ণুতা ও উদারতা

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে খ্রিস্ট ধর্মীয় বিভিন্ন দলের (ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট ও অর্থোডক্সদের) মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন

ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রুপগুলোর পারস্পরিক বিদ্বেষ দূর ও বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সকল ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চিন্তা ও ধারণা উত্থাপিত হয় এবং পরমতসহিষ্ণুতা ও উদারতার ওপর গুরুত্বারোপ শুরু হয়। ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী চিন্তাধারায় ধর্মীয় উদারতা এ অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় তাদের মধ্যে বিদ্যমান চিন্তা ও বিশ্বাসগত মতপার্থক্য বজায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করবে। মানবতাবাদী চিন্তাধারা যদিও ধর্মীয় পরমতসহিষ্ণুতা ও উদারতার ধারণা থেকেই পরিপুষ্ট হয়েছে, কিন্তু মানবতাবাদীরা মনে করে, মানুষের ধর্মীয় চিন্তা অতি প্রাকৃতিক কোন বিষয় নয়, বরং তা মানুষের অভ্যন্তর থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছ। তাদের মতে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়সমূহের উৎপত্তি ও ভিত্তিগত ঐক্য রয়েছে– যা বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে। তারা আল্লাহ সম্পর্কে পার্থিব এক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে থাকে এবং খ্রিস্ট ধারণার খোদাকে দার্শনিক বুদ্ধিবৃত্তিপ্রসূত এক চিন্তা বলে মনে করে যা ধর্মীয় চিন্তার ছাঁচে এক সহজ রূপ লাভ করেছে।

মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মীয় গণ্ডিতেই শুধু নয়, বরং ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেও উদার চিন্তার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, অথচ পূর্বে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোন সমঝোতা ছিল না। তবে এটাকে প্রাচীন গ্রীসের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতার দিকে প্রত্যাবর্তনের ফল বলা যেতে পারে। এ চিন্তাধারা অনুযায়ী সত্যের একত্বের ধারণাকে ভ্রান্ত এবং সকল মূল্যবোধ ও ধর্মই সৌভাগ্য ও সফলতার অধিকারী। মানবতাবাদীরা মনে করে, কোন জ্ঞান ও মূল্যবোধকেই সত্য বলা যায় না অর্থাৎ তারা জ্ঞান ও মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ আপেক্ষিক বলে মনে করে। তাদের দৃষ্টিতে জ্ঞান ও মূল্যবোধ মানুষের কারণে মূল্য লাভ করে। এ কারণে তারা যে কোন ধর্ম ও মূল্যবোধগত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ব্যক্তি ও সমাজের ইচ্ছা ও চাওয়ার ওপর নির্ভরশীল গণ্য করে।

সেক্যুলারিজ্‌ম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

যদিও মানবতাবাদীদের মধ্যে খোদা ও ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিও রয়েছেন এবং মানবতাবাদীদের আস্তিক ও নাস্তিক– এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, (এক্ষেত্রে যদি মানবতাবাদী চিন্তাধারাকে ধর্মবিমুখ ও ধর্মবিরোধী মনে নাও করি), তদুপরি বলা যায়, এ মতবাদটি ধর্মকে (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) অস্বীকারকারী ও খোদার সাথে পরিচিতিহীন। মানবতাবাদের ইতিহাস এ দাবির সত্যতাকে প্রমাণ করে। যেহেতু এ

চিন্তাধারায় আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে মৌলিক জ্ঞান করে, সেহেতু তা পর্যায়ক্রমে খোদাহীনতা, ধর্মবর্জন ও ধর্ম নিরপেক্ষতায় পর্যবসিত হয়।

আল্লাহ ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে সংস্কারবাদী যে চিন্তা ও ধারণা মার্টিন লুথার কিংয়ের দ্বারা উপস্থাপিত হয় এবং এর মাধ্যমে একদিকে খ্রিস্ট ধর্ম ও এর শিক্ষা ঐশী হওয়ার বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত হয়, অন্যদিকে পার্থিব জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে খোদার হস্তক্ষেপের অধিকারও অস্বীকৃত হয়, ফলে ঐশী প্রত্যাদেশ (ওহি) ও ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতি কোনরূপ আস্থা ব্যতিরেকেই পরম সত্তায় বিশ্বাসের ধারণার দর্শন উৎপত্তি লাভ করেছে যা সম্পূর্ণ নতুন ধারার এক আস্তিক্যবাদ। এ চিন্তার (Deism) প্রবক্তা হলেন ভল্টেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রি.) এবং ফ্রেডেরিক হেগেল। পরবর্তীকালে জুলিয়ান হাক্সলি (১৮৮৭-১৯৮৫ খ্রি.) খোদা ও ধর্ম এ দুয়ের প্রতিই সন্দেহ ও সংশয়ের অবতারণা করেন। অন্য মানবতাবাদীদের মধ্যে ফুইয়ার বাখ (১৭৭৫-১৮৩৩ খ্রি.), কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রি.) এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের অনুসারীরা খোদাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। উল্লেখ্য যে, হেগেলের মতো খোদাবিশ্বাসীরা যে ধারণায় খোদাকে উপস্থাপন করেছেন, তার সঙ্গে ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মে বর্ণিত খোদার বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

এমনকি বলা যায়, ধর্মকে সংস্কার করতে গিয়ে এ সকল ব্যক্তি খোদা ও ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সঙ্গে ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের ধারণায় বিদ্যমান খোদা ও ধর্মের কোন মিলই নেই এবং এ দু'ধর্মের মূল রূপের সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যশীল। তাঁরা তাঁদের এ ধরনের ব্যাখ্যার দ্বারা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে অন্তঃসারশূন্য করেছেন। সুতরাং খোদাবিশ্বাসী মানবতাবাদীদের দৃষ্টিতেও মানব জীবনে খোদা ও ধর্মের মৌলিক কোন ভূমিকা নেই; বরং এ দুটি বিষয় মানুষের হাতের দুটি হাতিয়ার মাত্র এবং মানুষ মূল নিয়ন্তা হিসেবে এ দুটিকে তার স্বার্থে ব্যবহার করে। টনি ডেভিস বলেন : 'ইংল্যান্ডে 'মানবতাবাদ' কথাটি উচ্চারিত হলে সাথে সাথেই শ্রোতার মনে প্রোটেস্ট্যান্ট ধারণার খোদা, এমনকি খোদার সাথে পরিচয়হীনতার অর্থ ভেসে ওঠে যা পূর্বে প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের খোদার সম্পূর্ণ বিপরীত। সার্বিকভাবে মানবতাবাদ পরিভাষাটির সাথে ঐশী শিক্ষার থেকে মুক্তির যেন অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্ক রয়েছে। টমাস হেনরী হাক্সলী (ডারউইনবাদের কট্টর সমর্থক) এবং চার্লস ব্রাডলফ খ্রিস্টধর্মের কঠিন প্রাণকে সংহারের জন্য মানবতাবাদীর প্রাণ হরণকারী থমকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের ধারণায় মানবতাবাদই পারবে খ্রিস্টধর্মের কাল্পনিক চিন্তার অবশিষ্ট অংশের মূলোৎপাটন করতে।

টনি ডেভিস অন্যত্র বলেন : 'অধিবিদ্যা ও অতি প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কিত ভাববাদী বিভিন্ন ধারণার প্রতি অগাস্ট কোঁতের শত্রুতার কারণে মানবতাবাদী চিন্তাধারা জনগণের কাছে পছন্দনীয় ধারণার খোদা অথবা খোদা পরিচিতিহীনতা ও সেক্যুলারিজমে পর্যবসিত হয়েছে যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

তিনি তাঁর গ্রন্থে খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী মানবতাবাদীদের সম্পর্কে বলেছেন : 'তারা মানবতাবাদ ও খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্যকে উপেক্ষা করে এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। যেমন অসীম ক্ষমতাবান এবং সর্বজ্ঞাতা খোদার বিশ্বাসের সাথে নিরঙ্কুশ ব্যক্তি স্বাধীনতার বৈপরীত্য।

ফিলিপ সিডনী, এডমন্ড স্পেনসার, ক্রিস্টোফার মার্লো, জন ডন এবং জন মিল্টনের মতো প্রোটেস্ট্যান্ট মানবতাবাদীদের লেখার বিভিন্ন স্থানে এ বৈপরীত্যের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

মুহাম্মাদ নাকিব আল আত্তাস লিখেছেন : 'নীচে (জার্মান দার্শনিক) যে ঘোষণা দিয়েছেলেন– 'খোদা মৃত্যুবরণ করেছেন', তা আজও পাশ্চাত্য বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রোটেস্ট্যান্টরা যেন খোদার এ পরিণতিকে মেনে নিয়ে আধুনিক সমাজ ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আরো বেশি প্রস্তুত হয়েছে।' নাকিব আল আত্তাস মনে করেন, প্রোটেস্ট্যান্টরা মানবতাবাদের বিপরীতে পশ্চাদপসরণ করতে করতে এমন স্থানে পৌঁছেছে যে, খ্রিস্টধর্মকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে ফেলেছে। আর্নেস্ট ক্যাসিরার তাঁর গ্রন্থে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের যুগে যে চিন্তাধারা ইউরোপকে আচ্ছন্ন করেছিল তা মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উৎসারিত বলে উল্লেখ করে বলেন : 'এ যুগে এ বিশ্বাস দৃঢ়তা লাভ করেছিল যে, মানুষকে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়বহির্ভূত বিশ্বাস এবং পূর্ব ধারণা ও বিচার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দান করে তার জন্য সৌভাগ্যের পথ মসৃণ করতে হবে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য জ্ঞান করতে হবে অর্থাৎ ঐ ধর্মের ঐতিহাসিক রূপ যাই হোক এবং যে চিন্তাগত ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হোক, তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সর্বোপরি রেনেসাঁর গতিধারার লক্ষ্যই ছিল প্রকাশ্যভাবে ধর্মকে সমালোচনা ও প্রশ্নের সম্মুখীন করা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি করা।'

অনুবাদ : এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

(আয়াতুল্লাহ মাহমুদ রাজাবী-এর মানব পরিচিতি গ্রন্থ থেকে অনূদিত)

মহান আল্লাহর ন্যায়বিচার সংক্রান্ত ধারণা

সংকলন : এস.এম. আশেক ইয়ামিন

আমাদের চারপাশে যে সকল ঘটনা আমরা ঘটতে দেখি, তার সবকিছুই কার্যকারণ ও ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল। আমরা সাধারণত যখন কোন ঘটনা ব্যাখ্যা করি তখন কেবল ঐ ঘটনার দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। আমরা বিবেচনা করি না যে, অস্তিত্বজগতের বিন্যাস-ব্যবস্থায় উক্ত ঘটনাটির অবস্থান কোথায় ও কী ধরনের? অথচ প্রতিটি ঘটনা– তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তা কতগুলো সুনির্দিষ্ট কার্যকারণের ফল এবং কতিপয় সুনির্দিষ্ট অবস্থা ও শর্তের সাথে জড়িত। যেমন কোন অগ্নিকাণ্ড অন্যান্য কার্যকারণ ও ঘটনার সাথে সংশ্রববিহীন অবস্থায় সংঘটিত হয় না। আর ঐ ঘটনাটি ঘটতে না দেয়াও বিশেষ কিছু কার্যকারণ ও অনুঘটক ব্যতিরেকে কখনই সম্ভবপর নয়। চাই সে সকল কারণ বস্তুগতই হোক অথবা অবস্তুগতই হোক।

এ জগতে কোন ঘটনাই অপরাপর ঘটনা ও প্রপঞ্চ থেকে স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন নয়। এ বিশ্বের সমুদয় অংশ একে অপরের সাথে যুক্ত; এ সংযোগ ও সম্পর্ক নিখিল বিশ্বের সকল অংশকেই সামিল করে এবং এতে এক সর্বজনীন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নিখিল বিশ্বের সমুদয় বস্তুর একে অপরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টি অর্থাৎ বিশ্বজগতের প্রকৃত ঐক্য আসলে কাঠামোগত ঐক্য। এটি এমনই এক বিষয় ও মূলনীতি যার ওপর মহান আল্লাহ্‌র হিকমত (প্রজ্ঞা) প্রতিষ্ঠিত। বস্তু বা পদার্থসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংশ্লিষ্টতা ও নির্ভরশীলতা সংক্রান্ত মূলনীতিটি মহান আল্লাহ্‌ তাআলার হিকমত বা প্রজ্ঞায় অত্যধিক বলিষ্ঠ ও দৃঢ় তাৎপর্যের অধিকারী হয়েছে। আর তা হচ্ছে নিখিল বিশ্বের অবিভাজ্যতা সংক্রান্ত অর্থ বা ধারণা। আমরা পরে এ মূলনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আমরা যদি আমাদের জীবন পরিক্রমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব যে, ঘটনাসমূহের পরম্পরা শিকলের বলয়ের ন্যায় একে অপরের সাথে যুক্ত। প্রতিটি ঘটনাই তৎপূর্ববর্তী ঘটনা ও তৎপরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ

আরেক কথায় প্রতিটি বস্তু নিজ অতীত ও ভবিষ্যতের সাথে যুক্ত। আর এ সম্পর্ক, সংশ্লিষ্টতা ও যোগ এক চিরস্থায়ী বন্ধনের সৃষ্টি করেছে।

আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, আমরা গবেষণামূলক অনুসন্ধান চালিয়ে যেসব ঘটনা পরস্পর বিপরীতমুখী এবং একই সময় সংঘটিত হয়, সেসব ঘটনার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা আবিষ্কার করতে পারি।

একজন রিফুকারী একটি কার্পেট রিফু করছে এবং একজন শল্য চিকিৎসক একজন রোগীর অপারেশন করছে। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হবে যে, এ দু'টি কাজের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই। তবে যদি আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে, রোগী দগ্ধ হওয়া ও কার্পেট পোড়ার কারণই ছিল এক অগ্নিকাণ্ড, তাহলে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে ও মানতে হবে যে, শল্য চিকিৎসকের কাজ ও রিফুকারীর কাজ মূলে একই উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে। একটি ঘটনা আছে তা যদি সংঘটিত না হতো তাহলে শল্য চিকিৎসক ও রিফুকারীর কেউই কর্মতৎপর হতেন না।

মহান আল্লাহ্‌র সুন্নাত বা নিয়ম

দার্শনিক পরিভাষায় যা 'বিশ্ব-ব্যবস্থা' এবং 'কার্যকারণ ও ফলাফল তন্ত্র' বলে অভিহিত তা ধর্মীয় ভাষায় 'সুন্নাত-ই ইলাহী' অর্থাৎ 'মহান আল্লাহ্‌র নিয়ম-রীতি' বলে অভিহিত। পবিত্র কোরআনের বেশ কয়েকটি স্থানে বলা হয়েছে : "তোমরা কখনই মহান আল্লাহ্‌র নিয়মে কোন পরিবর্তন (খুঁজে) পাবে না।" (সূরা আহ্‌যাব : ৬২, সূরা ফাত্‌হ : ২৩)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র কর্মকাণ্ডের বিশেষ পদ্ধতি ও স্থায়ী ফর্মূলা আছে এবং তা ধ্রুব। সূরা ফাতিরে এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বারবার বর্ণিত হয়েছে : "সুতরাং তুমি কখনই মহান আল্লাহ্‌র নিয়মে কোন পরিবর্তন খুঁজে পাবে না (অর্থাৎ কোন নিয়ম বিলুপ্ত হয়ে তদস্থলে নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হবে না) এবং তুমি কখনই মহান আল্লাহ্‌র নিয়মে কোন রূপান্তর খুঁজে পাবে না।"*[১](সূরা ফাতির : ৪৩)

নিঃসন্দেহে এটি এ মহান গ্রন্থের একটি বিস্ময়কর উক্তি। সত্যিই এ আসমানী গ্রন্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা এবং তাকওয়া অবলম্বনকারীদের সঙ্গী। বড় বড় দার্শনিক বছরের পর বছর সাধনা ও গবেষণা করে সর্বজনীন কার্যকারণ ও ফলাফল

*অর্থাৎ মানব রচিত বা প্রবর্তিত আইন বা ধারা বা উপধারা সংযোজন অথবা মূল ধারা বা আইন বাতিল না করে ঐ আইন বা ধারার কিছু অংশ বিলুপ্ত করে তদস্থলে নতুন কিছু সংযোজন করার মতো পরিবর্তনও মহান আলণ্ডাহ্‌র সুন্নাত বা নিয়মের ক্ষেত্রে সংঘটিত হবে না।

এবং সৃষ্টিজগতের বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা আবিষ্কার করেছেন। আর এ ধরনের আবিষ্কারের কারণে তাঁরা গর্বিত হয়ে ভাবছেন যে, কত আশ্চর্যজনক রহস্যের দ্বার উন্মোচন করেছেন! তাঁরা কত মহান ও তাৎপর্যমণ্ডিত বিধানই না শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। অথচ সবাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, পবিত্র কোরআন অতি বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট ভাষায় এ গুঢ় রহস্য বর্ণনা করে বলেছে : "মহান আল্লাহ্‌র নিয়ম-রীতি কখনই পরিবর্তিত হবে না।"

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া যে নিয়মের অধীন এবং এর যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে তা পবিত্র কোরআন শুধু সার্বিকভাবে বর্ণনা করে নি, বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও পদ্ধতি বর্ণনা করেছে।

মানব জাতির সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলেছে : "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্‌ ঐ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থা (ভাগ্য) পরিবর্তন করবেন না যে পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করবে।" (সূরা রা'দ : ১১)

এ আয়াতটি জাতিসমূহের প্রগতি, উন্নতি বা পশ্চাদপদতার মূল কারণ বা রহস্য বর্ণনা করেছে। কোন জাতিই দুর্ভাগ্য থেকে মুক্ত হয়ে সৌভাগ্যের মুখ দেখতে পারবে না যদি তারা নিজেরাই তাদের দুর্ভাগ্যের কারণসমূহ বিদূরিত না করে। ঠিক এর বিপরীতে যখন কোন সৌভাগ্যবান জাতি নিজেরাই নিজেদের দুভার্গ্য বয়ে আনে তখনই মহান আল্লাহ্‌ তাদেরকে দুর্ভাগা করেন।

আমরা অভিযোগ করি নি যে, মহান আল্লাহ্‌ কেন গুটিকতক ইহুদীকে ১০০ কোটির অধিক মুসলিম উম্মাহ্‌র ওপর বিভিন্ন দিক থেকে (সামরিক, রাজনৈতিক, চিন্তামূলক ও অর্থনৈতিক) আধিপত্য প্রদান করেছেন এবং তাদের ওপর কর্তৃত্বশীল করে দিয়েছেন? ১০ কোটি আরব কেন ৫ জুনের যুদ্ধে পরাজয়বরণ করল? মহান আল্লাহ্‌ কেন মুসলমানদেরকে সম্মান দিচ্ছেন না? মহান আল্লাহ্‌ কেন মুসলমানদের স্বার্থে প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ ঘুরিয়ে দিচ্ছেন না? এজন্য আমরা ক্রুদ্ধ হচ্ছি। রাগের কারণে আমাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে। আমরা কষ্ট পাচ্ছি। অভিযোগ-অনুযোগ করছি– আর্তনাদ করছি। দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনাও করছি। তবে আমাদের প্রার্থনার কোন উত্তর আমরা পাচ্ছি না। অথচ এ প্রশ্ন ও অভিযোগের যে উত্তর পবিত্র কোরআন আমাদেরকে দিয়েছে তা হলো : "মহান আল্লাহ্‌ ঐ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করবেন না যে পর্যন্ত তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করবে।"

মহান আল্লাহ্ তাঁর সুন্নাত বা বিধানের পরিবর্তন করেন না। আমাদের উচিত আমাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করা। আমরা অজ্ঞতা-মূর্খতা এবং চারিত্রিক অবক্ষয়ের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আমাদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি নেই। অথচ আমরা এমতাবস্থায় পৃথিবীর বুকে নেতৃত্বদান ও কর্তৃত্ব করার দুরাশা পোষণ করছি– এ ব্যাপারে আকাশকুসুম কল্পনা করছি। বাস্তবে এটা কখনই সম্ভব নয়।

বনি ইসরাইল বা ইহুদী জাতির পাপাচার ও পথভ্রষ্টতার কারণে তাদের মাঝে অন্যান্য জাতির চেয়ে অধিক সংখ্যক নবীকে প্রেরণ করা হয়েছিল। কারণ, আধ্যাত্মিক শিক্ষকের প্রতি তাদের প্রয়োজন ছিল অন্য যে কোন জাতির চেয়ে অনেক বেশি। এ ইহুদী জাতির ভাগ্যে যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনা ও পরিবর্তন সাধিত হবে সে ব্যাপারে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এ দু'টি ঘটনা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং পবিত্র কোরআনও উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এবং ইহুদী জাতির ইতিহাসে সেগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। এ সব ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা দু' দু'বার পৃথিবীতে ফিতনা করবে এবং মহান আল্লাহ্ তাদেরকে দমন করবেন ও শাস্তি দেবেন।

এরপর পবিত্র কোরআন একটি সর্বজনীন বিধি উল্লেখ করেছে। তা হচ্ছে এই : অপরাধ, পাপাচার ও দুর্নীতি দুর্ভাগ্য এবং পরাজয়ের প্রারম্ভিকাস্বরূপ। সংশোধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের মত পরিবর্তন আসলে মহান আল্লাহ্র দয়া ও কৃপার পুনঃনবায়ন করে। নিম্নে এতৎসংক্রান্ত আয়াতটি পেশ করা হলো :

"আমরা বনি ইসরাইলকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম : তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিশৃঙ্খলা করবে এবং আধিপত্য কায়েম করবে [অবৈধভাবে নিজেদের ক্ষমতা ও শক্তি অন্যান্য জাতির ওপর চাপিয়ে দেবে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করবে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশবাদী শক্তিবর্গ তাদের অধিকৃত উপনিবেশসমূহে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে তোমরাও সেটাই করবে)। সুতরাং তোমরা যখন প্রথমবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে (তোমাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য) আমাদের একদল মহাশক্তিধর বান্দাকে প্রেরণ করব এবং তাদেরকে তোমাদের ওপর কর্তৃত্বশীল করে দেব। তারা তোমাদেরকে দমন ও কঠোর শাস্তি প্রদান করবে এবং তোমাদের দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে যাবে। যদি পুনরায় তোমাদের অবস্থা পরিবর্তন কর তাহলে তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের ওপর বিজয়ী করব এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করব। তোমাদেরকে বিপুল জনশক্তি ও লোকবলের অধিকারী করব।

যদি তোমরা সৎ কাজ কর তাহলে তোমরা তোমাদের জন্যই সৎ কাজ ও মঙ্গল সাধন করলে। আর যদি তোমরা মন্দ কাজ কর তাহলে তোমরা নিজেদের জন্যই তা করলে। যদি তোমরা দ্বিতীয়বার বিশৃঙ্খলা কর তাহলে পুনরায় তোমাদের শত্রুদেরকে তোমাদের ওপর আধিপত্য দান করব। তারা তোমাদের মুখমণ্ডলকে বিকৃত করে দেবে। তারা নতুন করে তোমাদের দেশ ও জনপদে প্রবেশ করবে, এমনকি তারা তোমাদের ইবাদতগাহের মধ্যেও ঢুকে পড়বে (তোমাদের সবকিছু তারা তছনছ করে দেবে)। আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রভু তোমাদের ওপর দয়া করবেন (অর্থাৎ তিনি তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের পর তোমাদেরকে পুনরায় সৌভাগ্যবান করবেন)। তবে যদি তোমরা (সৎ পথ থেকে মিথ্যার দিকে) প্রত্যাবর্তন কর তাহলে আমরাও ফিরে যাব (কারণ এটাই হচ্ছে আমাদের বিধান বা নিয়ম যে, যদি তোমরা শতবার ফিতনা কর তাহলে আমরাও শতবার তোমাদের দমন ও কঠোর শাস্তি দেব। যদি তোমরা সৌভাগ্যবান হওয়ার জন্য নিজেদেরকে পরিবর্তন কর, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে আমাদের আচরণ-পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনব)। আর আমরা জাহান্নামকে কাফিরদের ধারণকারী (বেষ্টনকারী) আবাসস্থলরূপে নির্ধারণ করে রেখেছি।" (সূরা ইসরা : ৪-৮)

আসলে এ আয়াতসমূহ পূর্বোক্ত সর্বজনীন বিধানেরই সম্প্রসারণ। আর ঐ সর্বজনীন বিধানটিই হলো : "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা তাদের অবস্থা পরিবর্তন না করবে।"

আইন-কানুন কী?

ইতোমধ্যে যা আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ নিখিল বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা বা প্রপঞ্চ মহান আল্লাহ্র কতগুলো অপরিবর্তনীয় নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতির প্রভাবাধীন। অর্থাৎ এ নিখিল বিশ্বে মহান আল্লাহ্র কতগুলো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন আছে যেগুলোর বাইরে তিনি কখনই কোন কাজ আঞ্জাম দেন না।

এখন আমরা আইন-কানুনের প্রকৃত অর্থ জানার চেষ্টা করব।

সুন্নাত বা নিয়ম-রীতির অর্থ কী? মহান আল্লাহ্র নিয়ম-নীতি (সুন্নাত) ও আইন-কানুন কি মানব রচিত বিধি-বিধানসমূহের ন্যায় অর্থাৎ তা কি সামাজিক অঙ্গীকার ও চুক্তি এবং মানসিক দায়বদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতার অনুরূপ? অথবা এগুলো তাঁরই বিশেষ

সৃষ্টি (মাখলূক)? মহান আল্লাহ্‌র সুন্নাত অর্থাৎ নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ দু'টি ব্যাখ্যার কোনটিই কি সঠিক নয়? সে যা-ই হোক, মহান আল্লাহ্‌র পক্ষে তাঁর নিজ নিয়ম-নীতি সৃষ্টি করা বা না করা সম্ভব কি? মহান আল্লাহ্‌র নিয়মের পরিবর্তন সাধন কেন অসম্ভব?

এ সব প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় : নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন এমন কিছু নয় যা বিশেষ ও স্বতন্ত্র কোন সৃষ্টি। আইন-কানুন হচ্ছে সামগ্রিক (সর্বজনীন) ধারণা যা মানব-মন নির্ণয় করে (অর্থাৎ তা হচ্ছে নির্বস্তুক)। বাস্তবে অর্থাৎ মনোজগতের বাইরে তা সর্বজনীনতা এবং আইন-কানুনের অবয়বে বিদ্যমান নেই। বাস্তবে যা কিছু আছে সেগুলো আসলে কার্যকারণ ও ফলাফল তন্ত্র এবং অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর যেগুলো আমাদের মানসপটে বহিঃজগত অর্থাৎ বাস্তব জগত বা বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিষ্কাষিত হয়ে বিমূর্ততা লাভ করে অর্থাৎ নির্বস্তুক হয়ে যায় এবং সেগুলো আইন-কানুন, সূত্র ও বিধি-বিধানের অবয়বে আমাদের মানসপটে অঙ্কিত ও প্রতিফলিত হতে থাকে।

ব্যতিক্রমসমূহ

সৃষ্টি জগতের নিয়ম-কানুনে কি ব্যতিক্রম আছে? মুজিযা ও অলৌকিক কর্ম কি মহান আল্লাহ্‌র সুন্নাত বা নিয়ম রূপে পরিগণিত?

এ দুই প্রশ্নের জবাব না বোধক। না সৃষ্টি জগতের নিয়ম-কানুনে ব্যতিক্রম আছে, আর না অলৌকিক (অতি প্রাকৃতিক) কার্য সৃষ্টি জগতের নিয়মের ব্যতিক্রম বলে গণ্য।

যদি বিশ্বজগতে ক্রিয়াশীল নিয়মে কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তাহলে এ সব পরিবর্তন হবে শর্ত, অবস্থা ও পরিবেশের পরিবর্তনের ফলস্বরূপ। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, প্রতিটি নিয়ম বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে ক্রিয়াশীল হয় অথবা শর্ত, অবস্থা ও পরিবেশওপরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্য কোন নিয়ম বলবৎ হয়। আর ঐ নতুন নিয়মও বিশেষ বিশেষ শর্ত ও অবস্থার সাপেক্ষেই কেবল সর্বজনীনতার অধিকারী। তাই নিয়মের পরিবর্তনও আসলে এক ধরনের নিয়ম। তবে তা এতদর্থে নয় যে, কোন একটি নিয়ম আরেকটি নিয়ম দ্বারা বিলুপ্ত (নাস্‌খ) হয়, বরং তা এ অর্থে যে, একটি নির্দিষ্ট নিয়মের যাবতীয় শর্ত পরিবর্তন হয়ে যায় এবং নতুন শর্ত ও অবস্থার উদ্ভব হলেই নতুন নিয়ম বলবৎ হয়। বিশ্বে অপরিবর্তনীয় (ধ্রুব) নিয়ম ব্যতীত অন্য কিছু বিদ্যমান নেই। যদি কোন মৃত ব্যক্তি অলৌকিকভাবে জীবিত হয়ে যায়, তাহলে এরও একটা হিসাবগুনিকাশ ও নিয়ম আছে। আর হযরত ঈসা ইবনে

মারিয়ামের মতো কোন মানব শিশু যদি বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করে তাহলে সেটাও মহান আল্লাহ্‌র সুন্নাত; তা বিশ্ব জগতে বিদ্যমান মহান আল্লাহ্‌র নিয়মের পরিপন্থী নয়।

মানুষ সৃষ্টিলোকের সকল নিয়ম-কানুনের সাথে পরিচিত নয়। তাই যখনই সে কোন কিছুকে তার পরিচিত নিয়মের বিপক্ষে বিবেচনা করে, তখনই সে মনে করে যে তা নিঃশর্তভাবে নিয়মের ব্যতিক্রম এবং কার্যকারণ ও ফলাফল তন্ত্রের লঙ্ঘন। আর সে অনেক ক্ষেত্রেই যা কিছুকে নিয়ম হিসেবে জানে আসলে তা প্রকৃত নিয়ম নয়, বরং তা হচ্ছে নিয়ম-কানুনের খোলস মাত্র। যেমন : আমরা মনে করি যে, প্রাণ বা জীবের সৃষ্টি সংক্রান্ত নিয়ম হচ্ছে এই যে, পিতাগুমাতার যৌন মিলনের ফলেই সর্বদা প্রাণীর জন্ম হয়ে থাকে। তবে এটা প্রকৃত নিয়ম (সুন্নাত) নয়, বরং এটা হচ্ছে নিয়মের খোলস মাত্র। হযরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি বা জন্ম সৃষ্টিলোকে কর্তৃত্বশীল নিয়মগুকানুনের খোলসকেই কেবল লণ্ডগুভণ্ড করে দিয়েছে; তবে তা প্রকৃত নিয়মগুকানুনকে পাল্টে দেয় নি। 'সৃষ্টিলোকের প্রকৃত নিয়মসমূহে কোন ব্যতিক্রম নেই'– এটি হচ্ছে একটি বক্তব্য বা বিষয় এবং আমরা যে নিয়মগুকানুনের সাথে পরিচিত সেগুলো কি আসলেই বিশ্বগুব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত নিয়ম, না প্রকৃত নিয়মের খোলস মাত্র, তা হচ্ছে ভিন্ন একটি বিষয়।

মুজিযার (নবী-রাসূলগণের অলৌকিক কার্যাবলি) অর্থ নিয়মহীনতা অথবা নিয়ম-কানুনের উর্ধ্বে হওয়া নয়। বস্তুবাদীরা আসলে ভুল বুঝেছে এ কারণে যে, তারা প্রকৃতি জগতের বেশ কিছু নিয়ম যেগুলো বিজ্ঞানের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোকেই এ বিশ্ব জগতের একমাত্র প্রকৃত নিয়ম বলে গণ্য করেছে। অতঃপর তারা মুজিযাসমূহকে নিয়মের লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করেছে। তবে আমরা বলি যে, বিজ্ঞান যা কিছু বর্ণনা করেছে তা আসলে কতগুলো বিশেষ ও সীমিত অবস্থা ও শর্তের ক্ষেত্রে সত্য এবং যখন মহান আল্লাহ্‌র কোন নবী বা ওলীর ইচ্ছায় কোন অলৌকিক কাজ সংঘটিত হয় তখন শর্ত ও অবস্থাসমূহের পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী শক্তির সাথে যুক্ত একটি আত্মা বা প্রাণসত্ত্বা তখন বিদ্যমান অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেয়। অন্য কথায় বলা যায়, তখন এক বিশেষ কারণ বা মৌল অবস্থা ময়দানে অবতীর্ণ হয়। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, নতুন নতুন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ভিন্ন একটি নিয়ম ক্রিয়াশীল হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আসলে মহান আল্লাহ্‌র ওলীর শক্তিশালী ও আধ্যাত্মিক ইচ্ছা শক্তির দ্বারা এ নতুন অবস্থার উদ্ভব হয়।

বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে দোয়া ও দান-সদকার প্রভাবের ক্ষেত্রেও আসল ব্যাপারটা ঠিক এ রকমই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, প্রতিটি ঘটনা বা বিষয় যা বিশ্বজগতে ঘটে থাকে, তা মহান আল্লাহ্‌র অবশ্যম্ভাবী ক্বাযা ও কাদরের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে প্রার্থনা ও ঔষধের (দোয়া ও দাওয়া) কী ভূমিকা ও প্রভাব থাকতে পারে। তিনি এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন : "দোয়া এক ধরনের ক্বাযা ও কাদর।"[১]

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (আ.) একটি প্রাচীরের পাশে বসে ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ঐ প্রাচীরটি ভাঙ্গা এবং তা ধসে পড়তে পারে। তাই তিনি সাথে সাথেই সেখান থেকে উঠে নিরাপদ দূরত্বে চলে যান। তখন একজন লোক তাঁকে আপত্তির সুরে বলল : "আপনি মহান আল্লাহ্‌র ক্বাযা (নির্ধারিত ভাগ্য) থেকে পলায়ন করছেন?" অর্থাৎ আপনার মৃত্যুই যদি নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে ভাঙ্গা প্রাচীরের কাছ থেকে দূরে চলে যান বা না যান, আপনার মৃত্যু হবেই। আর যদি এটাই নির্ধারিত হয়ে থাকে যে, আপনি আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, তাহলে আপনি সর্বাবস্থায়ই নিরাপদ থাকবেন। তাই ভাঙ্গা প্রাচীরের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার কোন অর্থ আছে কি? তখন হযরত আলী (আ.) জবাবে বলেছিলেন : أفرّ من القضاء الله إلى قدره "আমি মহান আল্লাহ্‌র ক্বাযা থেকে তাঁর কাদরের দিকে ছুটে যাচ্ছি।"[২]

এ বাক্যটির অর্থ হলো এই যে, এ বিশ্বজগতে যে কোন ঘটনাই ঘটুক না কেন, তা মহান আল্লাহ্‌র ঐশ্বরিক ক্বাযা ও তাকদীরের অধীন ক্ষেত্র বা বিষয়। মানুষ যদি নিজেকে বিপদের মুখোমুখি করে এবং এ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলেও তা হবে মহান আল্লাহ্‌র ক্বাযা ও অমোঘ নিয়ম। আবার যদি সে বিপদ থেকে পলায়ন করে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলেও তা হবে মহান আল্লাহ্‌র নিয়ম ও তাকদীর। মানুষ যদি রোগজীবাণু দ্বারা কলুষিত কোন পরিবেশে প্রবেশ করে অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে সেটাও যেমন মহান আল্লাহ্‌র ঐশ্বরিক নিয়ম বলে গণ্য হবে, তেমনি সে যদি ঔষধ সেবন করে রোগ থেকে সুস্থ হয়ে যায়, তাহলেও তা মহান আল্লাহ্‌র নিয়ম বলে গণ্য হবে। সুতরাং কোন মানুষ যদি ভাঙ্গা প্রাচীরের কাছ থেকে উঠে নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়, তাহলে সে মহান আল্লাহ্‌র নিয়ম ও ক্বাযা বিরোধী কোন কাজ করেনি এবং এ অবস্থায় মহান আল্লাহ্‌র নিয়ম হচ্ছে এই যে, মানুষ দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যদি সে ভাঙ্গা প্রাচীরের কাছে বসে থাকে এবং তার

ওপর দেয়ালটা ধসে পড়ার কারণে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে এটাও হবে সৃষ্টিলোকেরই নিয়ম।

পবিত্র কোরআন এ সত্যটি একটু ভিন্ন ও আকর্ষণীয়ভাবে সূরা তালাকে বর্ণনা করেছে:

و من يتّق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و من يتوكّل على الله فهو حسبه إنّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكلّ شيئ قدرا

"আর যারা মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তাদের জন্য মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন এবং তাদেরকে তিনি জীবিকা প্রদান করেন যা সে ভাবতেও পারে না তা থেকে; আর যারা মহান আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে, তিনিই তাদের জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্‌ তাঁর নির্দেশ বা বিধানকে চূড়ান্ত করেন। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্‌ প্রতিটি জিনিসের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ও মাত্রা নির্ধারণ করেছেন।"– (সূরা তালাক : ২-৩)

এ আয়াতে যে নিয়ম সকল নিয়মের ওপর কর্তৃত্বশীল তা বর্ণিত হয়েছে এবং তা হচ্ছে খোদাভীতি (তাকওয়া) ও তাঁর ওপর ভরসা (তাওয়াক্কুল)।

এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তাওয়াক্কুল করার পরিপ্রেক্ষিতেই মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ হচ্ছে একটি চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় বিষয়। যে কেউ মহান আল্লাহ্‌র ওপর যথাযথ ভরসা করে, সে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করবে এবং মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা– যা আসলে এক বিশেষ পথে বান্দার কাছে পৌঁছায় এবং একটি সুন্নাত, তা সকল নিয়মের ওপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও কর্তৃত্বকারী। অথচ যাতে কেউ ভুলে না যায় যে, মহান আল্লাহ্‌র কাজেরও নিয়মশৃঙ্খলা আছে তাই তিনি পবিত্র কোরআনে বলেছেন : "যে কেউ তাকওয়াপরহেজগারী অবলম্বন করবে মহান আল্লাহ্‌ তার জন্য মুক্তির একটি পথ দেখিয়ে দেবেন।" অর্থাৎ তাঁর কাজ নিয়ম-বহির্ভূত ও মাধ্যমবিহীন নয়, যদিও তাঁর কাজের মাধ্যম সাধারণ মাধ্যম ও পরিচিত পদ্ধতি না-ও হয়, তবুও তাঁর কাজের মাধ্যম হচ্ছে এমন যা মানুষ কখনো ভাবতেও পারে না (من حيث لا يحتسب)।

কাযা ও কাদ্‌র এবং জাব্‌র (অদৃষ্টবাদ) প্রসঙ্গ

ভাগ্য ও নিয়তি (তাকদীর) যদি বিশ্বলোকের বিধি ও নিয়ম-কানুন থাকা অর্থে নেয়া হয়, তাহলে কাযা ও কাদ্‌রে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে উদ্ভূত জাব্‌র সংক্রান্ত আপত্তির সমাধান সম্ভব হবে। জাব্‌র এ কারণে উদ্ভূত হয়েছে যে, একদল লোক ধারণা করেছে, ভাগ্য ও নিয়তি অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ্‌ প্রত্যক্ষভাবে এবং এ বিশ্বলোকের নিয়ম-

কানুনের বাইরে সব প্রপঞ্চকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন। নিম্নোক্ত চতুস্পদী কবিতাটি (রুবাঈ) উমর খাইয়ামের রচিত বলে দাবী করা হয়েছে :

"আমি মদ্যপায়ী, আর যে কেউ আমার মতোই মদ্যপায়ী হবে,
তার কাছে আমার মদ্যপান সহজ (প্রতিভাত) হবে।
অনাদি-অনন্তকাল থেকে জানতেন স্রষ্টা আমার মদ্যপান,
যদি না করি মদ্যপান, তবে হবে অজ্ঞতায় পর্যবসিত স্রষ্টার জ্ঞান।"

এ কবিতার রচয়িতা ধারণা করেছেন, যে কোনো কাজ সম্পাদন করার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পরিপন্থী। তাই সে ভেবেছে, যদি মানুষ চায় মদ্যপান না করতে, তাহলে তা সম্ভব নয়। কারণ মহান আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা ছিল যে, সে মদ্যপান করবে; আর যেহেতু মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও জ্ঞান অলঙ্ঘনীয়, সেহেতু মানুষ ইচ্ছা করুক বা না করুক, সে মদ্যপান করবেই।

আসলে এ ধরনের কথা একেবারে অসার। অজ্ঞতাবশতই কেবল এ ধরনের কথা বলা সম্ভব। এ কারণেই এ রুবাঈর রচয়িতা দার্শনিক খাইয়াম, তা বিশ্বাস করা যায় না। প্রত্যেক দার্শনিক ও আধা-দার্শনিক ব্যক্তি এতটা বোঝেন যে, মহান আল্লাহ্‌ যেমন সরাসরি কোনো ব্যক্তির মদ্যপানের ইচ্ছা করেন নি, তেমনি তিনি সরাসরি কোনো ব্যক্তির মদ্যপান না করারও ইচ্ছা করেন নি। মহান আল্লাহ্‌ এ বিশ্বলোকের জন্য বিধি ও নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেছেন এবং এ বিশ্বজগতে কোন কাজই নিয়মের বাইরে সম্পাদিত হয় না। যেমনি কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া সংঘটিত হয় না, তেমনি মানুষের ঐচ্ছিক কাজগুলোও মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতার বাইরে সংঘটিত হয় না।

মানুষের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র বিধান হচ্ছে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও নির্বাচন করার ক্ষমতা থাকবে। মানুষ নিজেই ভালো অথবা মন্দ কাজ নিজের ইচ্ছা অনুসারে আঞ্জাম দেবে। কারণ, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ভালো-মন্দ নির্বাচন করার ক্ষমতা মানব সত্তা ও তার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য গাঠনিক উপাদান। তাই ইচ্ছা ও নির্বাচন ক্ষমতাবিহীন মানুষের অস্তিত্ব অসম্ভব। অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি ও নির্বাচন করার ক্ষমতাবিহীন মানুষের অস্তিত্ব যদি কল্পনা করা হয়, তাহলে তা হবে নিছক অবাস্তব কল্পনা। আর যদি কোনো সৃষ্টি মানুষ না হয়, তাহলে তার কোনো ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য (তাকলীফ) নেই। যেমন গরু অথবা গাধা যদি মদের পাত্রে মাথা ডুবিয়ে আকণ্ঠ মদ পান করে, তবুও এতে তার কোনো পাপ হবে না (কারণ এদের কোন ধর্মীয় দায়িত্ব নেই)। অতএব, যে ঐশ্বরিক কাযা ও কাদ্‌র মানুষকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছে, সেই কাযা ও কাদ্‌রই

আবার তাকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও নির্বাচন করার ক্ষমতাসম্পন্ন করে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছে। তাই মানুষের মদ্যপান যদি শুধু তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন নির্বাচন করার ভিত্তিতে না হয়ে অনাদি-অনন্তকালীন (ঐশ্বরিক) জ্ঞানের বিপরীতে ঐশ্বরিক অদৃষ্টবাদের ভিত্তিতে হয় অর্থাৎ মানুষ যদি ঐশ্বরিক অদৃষ্টবাদের আওতায় মদ্যপান করে, তাহলে মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান অজ্ঞতায় পর্যবসিত হবে (কারণ আল্লাহ্ জানেন, মানুষ তার নিজ ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার ভিত্তিতেই ভালো বা মন্দ কাজ সম্পাদন করে)।

কবি খাইয়ামই কি দার্শনিক উমর খাইয়াম– এ ব্যাপারে যে সব গবেষক সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁরা এ সম্ভাবনাও ব্যক্ত করেছেন; বরং প্রমাণ করেছেন, কবি খাইয়াম ও দার্শনিক খাইয়াম এক ব্যক্তি নন; বরং দু' বা ততোধিক ব্যক্তি। কিন্তু ইতিহাসে তাঁরা আলাদাভাবে শনাক্ত হন নি। যা হোক, ইতিহাসে একাধিক খাইয়াম থাকুন অথবা দুই বিপরীত ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন খাইয়ামই থাকুন, মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান এবং (ঐশ্বরিক) ভাগ্য ও নিয়তিই যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ভালো-মন্দ নির্বাচন করার ক্ষমতার অধিকারী মানুষের কাছ থেকে তার ইচ্ছাশক্তি ও ইখতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তাকে পাপ করতে বাধ্য করে– এ ধরনের কথা সম্পূর্ণরূপে বাতিল। তাই নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিতে এর সঠিক জবাব দিয়ে বলা হয়েছে :

علم ازلی علت عصیان کردن نزد عقلاء زغایت جهل بود

"মহান আল্লাহ্‌র অনাদি-অনন্তকালীন জ্ঞানই (علم ازلی) মানুষকে পাপ করতে ও অবাধ্য হতে বাধ্য করে– এ কথা জ্ঞানীদের কাছে চূড়ান্ত পর্যায়ের অজ্ঞতা বলে গণ্য।"[১]

বৈষম্য ও পার্থক্য সংক্রান্ত আপত্তির উত্তরের সার-সংক্ষেপ

১. অস্তিত্বজগৎ কতকগুলো সহজাত ও অপরিবর্তনশীল (ধ্রুব) নিয়ম-কানুন এবং ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে আর এ কারণেই অস্তিত্বজগতে প্রতিটি প্রপঞ্চ ও বস্তুর বিশেষ পর্যায় ও অবস্থান রয়েছে যাতে কখনোই পরিবর্তন সাধিত হয় না।

২. অস্তিত্বের সুশৃঙ্খল বিন্যাস-ব্যবস্থা থাকার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে, অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায়বিশিষ্ট হওয়া আর এটাই যাবতীয় পার্থক্য, অনস্তিত্ব ও ঘাটতির উদ্ভব হওয়ার কারণ।

৩. পার্থক্য আসলে সৃষ্ট নয়; বরং তা হচ্ছে সৃষ্টলোকের সব বস্তু ও প্রপঞ্চের সহজাত অনিবার্য বিষয়। আর যদি কেউ ধারণা করে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিকুলের মাঝে বৈষম্য করেছেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তা হবে একটি ভুল ধারণা।

৪. যে বিষয়টি ন্যায়পরায়ণতা (আদালত) ও প্রজ্ঞার (হিকমত) পরিপন্থী হতে পারে, তা পার্থক্য নয়, বরং তা হচ্ছে বৈষম্য। আর এ বিশ্বলোকে যা বিদ্যমান, তা বৈষম্য নয়, বরং তা হচ্ছে পার্থক্য।

অকল্যাণ বা অমঙ্গল

মহান আল্লাহ্‌র ন্যায়পরায়ণতা সংক্রান্ত আপত্তিসমূহ কয়েক ভাগে বিভক্ত। যথা:- বৈষম্য (التبعيض), (অস্তিত্বশীল সত্তাসমূহের অস্তিত্বের) ধ্বংস ও বিলুপ্তি (الفناء) , ত্রুটি ও ঘাটতি এবং বিপদাপদসমূহ (الآفات)। আমরা পূর্ববর্তী সংখ্যাসমূহে এ চার ধরনের আপত্তির মধ্য থেকে 'বৈষম্য' শিরোনামে কেবল প্রথম আপত্তিটি আলোচনা করেছি। এখন আমরা 'অকল্যাণ বা অমঙ্গল' শিরোনামে অবশিষ্ট আপত্তিসমূহ নিয়ে আলোচনা করব এবং এগুলোর জবাব দেব।

দার্শনিকগণ অকল্যাণ সংক্রান্ত যে জবাব দিয়েছেন, তা তিন অংশে বিভক্ত। যথা:-

ক. অকল্যাণসমূহের প্রকৃত স্বরূপ কী? অনিষ্ট ও অকল্যাণসমূহের কি কোনো প্রকৃত অস্তিত্ব আছে, না এগুলো আপেক্ষিক ও অনস্তিত্বমূলক বিষয়?

খ. মন্দ ও অকল্যাণসমূহ অস্তিত্বমূলক বা অনস্তিত্বমূলক– যা-ই হোক না কেন, কল্যাণ ও অকল্যাণসমূহ কি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন, নাকি অবিচ্ছিন্ন? কল্যাণ ও অকল্যাণসমূহ অবিচ্ছিন্ন হওয়ার ধারণার ভিত্তিতে যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ সহ এ গোটা বিশ্বজগৎ ভালো, নাকি মন্দ? কল্যাণসমূহ কি অকল্যাণসমূহের চেয়ে অধিক অথবা অকল্যাণসমূহ কল্যাণসমূহের চেয়ে অধিক? অথবা কোনটিই কোনটির চেয়ে অধিক নয়; বরং সমান।

গ. অকল্যাণসমূহের অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক, কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হোক বা না হোক, যা কিছু এ বিশ্বলোকে অকল্যাণ বলে গণ্য, সেগুলো কি আসলেই অকল্যাণ এবং তাদের কি কোন কল্যাণগত দিকই নেই অর্থাৎ সেগুলো কি অন্ততপক্ষে এক বা একাধিক কল্যাণের ভিত্তি ও প্রারম্ভিকা নয়? অথবা

প্রতিটি অকল্যাণের মাঝে কি কোন কল্যাণ; বরং বেশ কিছু কল্যাণ লুক্কায়িত আছে অর্থাৎ প্রতিটি অকল্যাণ কি এক বা একাধিক কল্যাণের কারণ?

অস্তিত্বের দ্বি-উৎস বিশিষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গ

দ্বিত্ববাদের মূল কথা হচ্ছে, যেহেতু অস্তিত্ব সত্তাগতভাবে দু' ধরনের : ভালো অস্তিত্ব ও মন্দ অস্তিত্ব, সেহেতু আমাদের বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হবে যে, এ সব ভালো ও মন্দ অস্তিত্ব দু'টি স্বাধীন উৎসমূল থেকে উৎসারিত হয়ে থাকবে অর্থাৎ মন্দ ও অকল্যাণসমূহের এবং ভালো ও কল্যাণসমূহের স্বতন্ত্র স্রষ্টা রয়েছে। (দ্বিত্ববাদ মতে সৃষ্টিকুলের একটি শাখা হচ্ছে মঙ্গলসমূহের শাখা যার উৎস মঙ্গলসমূহের স্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ্ (ইয়াযদান) এবং অপর শাখাটি হচ্ছে অমঙ্গলসমূহের শাখা যার স্রষ্টা হচ্ছে অমঙ্গলসমূহের স্রষ্টা বা আহ্রিমান। এ ধরনের মতবাদ নিঃসন্দেহে তাওহীদের পরিপন্থী ও শির্ক।– অনুবাদক)

আসলে দ্বিত্ববাদীরা মহান আল্লাহ্কে মন্দ বিষয় থেকে মুক্ত বলতে চেয়েছে। কিন্তু তারা এটা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করেছে। যে দ্বিত্ববাদ বিশ্বজগতকে ভালো ও মন্দ– এ দু' বলয়ে বিভক্ত করেছে এবং অকল্যাণসমূহের অস্তিত্বকে বাড়তি; বরং ক্ষতিকর বলে গণ্য করেছে এবং বাধ্য হয়েই এগুলোকে মহান আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে, সেই দ্বিত্ববাদের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মতোই নিরূপায় ও সামর্থ্যহীন। তাই বিদ্যমান অবস্থা তাঁকে কষ্ট দেয় এবং তিনি তাতে মোটেও সন্তুষ্ট নন। কিন্তু তিনি মন্দ ও অমঙ্গলকামী প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন, যে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করেই চলেছে।

দ্বিত্ববাদীরা মহান আল্লাহ্র অপরিসীম ক্ষমতা, প্রাধান্য বিস্তারকারী ইচ্ছাশক্তি এবং তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী কাযা ও কাদ্রে বিশ্বাসকে তাঁর প্রজ্ঞাময়, ন্যায়পরায়ণ ও কল্যাণময় হওয়ার বিশ্বাসের পাশাপাশি সংরক্ষণ করতে পারে নি।

কিন্তু ইসলাম মহান আল্লাহ্কে সব অস্তিত্বময় সত্তার অস্তিত্বের উৎস এবং অশেষ দয়া, করুণা ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রজ্ঞার অধিকারী বলে বিশ্বাস করার পাশাপাশি তাঁর শক্তিশালী ইচ্ছা এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারেও মোটেই দ্বিধা-সংশয় প্রকাশ করে নি। ইসলাম সব বস্তু ও অস্তিত্ববান সত্তাকে, এমনকি শয়তান ও তার যাবতীয় কাজকেও (যেমন মানুষকে বিচ্যুত করা) মহান আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত বলে গণ্য করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে অকল্যাণ প্রসঙ্গটি ভিন্ন এক পদ্ধতিতে সমাধান করা সম্ভব। আর তা হলো, এক দৃষ্টিতে এ নিখিল বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও বিষয় ভালো ও মন্দ– এ দু' অংশে বিভক্ত। তবে আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে এ সৃষ্টিজগতে কোন অকল্যাণের অস্তিত্ব নেই। যা কিছু এ বিশ্বজগতে বিদ্যমান, তা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর বিদ্যমান 'জাগতিক ব্যবস্থা' হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যবস্থা এবং যা কিছু বিদ্যমান, তার চেয়ে উত্তম কোনো কিছুর অস্তিত্ব আসলেই অসম্ভব।

অকল্যাণ প্রসঙ্গে এ ধরনের জবাব দান বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে এক বিশেষ ধরনের দর্শনের ওপর নির্ভরশীল। আর এ বিশেষ দর্শনের আওতায়ই অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব প্রসঙ্গটি গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্বিত্ববাদের মোকাবিলায় এ দর্শন যে উত্তর দিয়ে থাকে, তা হচ্ছে, অকল্যাণসমূহের আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। আর এ কারণেই (মহান আল্লাহ্ ছাড়া) এগুলো ভিন্ন কোনো স্রষ্টা ও উৎসমূলেরও মুখাপেক্ষী নয়। এ বিষয়টি দু'ভাবে ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করা সম্ভব। যথা:-

১. অকল্যাণের অনস্তিত্বশীল হওয়া এবং

২. অকল্যাণের আপেক্ষিক হওয়া

আর এ দু'টি বিষয় ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে অস্তিত্বের দ্বি-উৎসমূল বিশিষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায়।

অমঙ্গল অনস্তিত্বমূলক বিষয়

সরল বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অমঙ্গলসমূহের স্বরূপ হচ্ছে অনস্তিত্ব। অর্থাৎ সব ধরনের কদর্যতা ও মন্দ আসলে অস্তিত্বহীন। এ বিষয়ের একটি দীর্ঘ পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। এ চিন্তার শিকড় প্রাচীন গ্রীসে প্রোথিত। দর্শনের গ্রন্থাদিতে এ চিন্তা বা বিশ্বাসকে প্রাচীন গ্রীকদের বিশেষ করে আফলাতুনের (প্লোটো) সাথে সম্পৃক্ত বলে ধারণা করা হয়েছে। তবে আফলাতুনের পরবর্তী দার্শনিকগণ এ চিন্তা বা বিশ্বাসের আরো বেশি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা যেহেতু এ বিষয়কে সঠিক ও মৌলিক বলে বিশ্বাস করি তাই তা আমাদের আলোচনার উপযোগী করে এখানে উপস্থাপন করব এবং যেহেতু বিষয়টি একটু কঠিন সেহেতু প্রারম্ভিকাস্বরূপ সম্মানিত পাঠকবর্গের কাছে অনুরোধ করব যেন তাঁরা একটু ধৈর্য অবলম্বন করতঃ এ আলোচনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বিষয়টির ইপ্সিত অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন। আমরা মনে করি

যে, এ আলোচনার বেশ গুরুত্ব আছে। তাই তা নিয়ে গভীর চিন্তাওভাবনা করার প্রয়োজনও আছে। তবে আমরা যতদূর সম্ভব বিষয়টি খুব সহজ ভাষায় ও সবার বোধগম্য করে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

যাঁরা বলেন যে, অমঙ্গল ও অকল্যাণ (الشّر) অনস্তিত্বমূলক বা অস্তিত্বহীন (عدمي) তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটি নয় যে, 'মন্দ ও অকল্যাণ' নামে যা কিছু অভিহিত হয় আসলে সেগুলোর প্রকৃত কোনো অস্তিত্ব নেই যার ফলে বলা যাবে যে, এগুলো অবশ্যম্ভাবিতাবিরোধী (خلف الضرورة)। আমরা চাক্ষুষভাবে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করি যে, অন্ধত্ব, বধিরত্ব, রোগওব্যাধি, অন্যায়ওঅবিচার, অজ্ঞতা, সামর্থ্যহীনতা, মৃত্যু, ভূমিকম্প ইত্যাদির অস্তিত্ব (الوجود) রয়েছে; না এগুলো অস্বীকার করা সম্ভব, আর না এগুলোর অকল্যাণ হবার বিষয়ও অগ্রাহ্য করা সম্ভব। আর বিষয়টি এমন নয় যে, যেহেতু অমঙ্গল অনস্তিত্বমূলক সেহেতু অমঙ্গলের অস্তিত্ব নেই। আর যখন কোনো অমঙ্গলের অস্তিত্বই নেই তখন মানুষেরও কোনো দায়িত্বওকর্তব্য নেই। কারণ, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সকল অনিষ্ট ও মন্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং যা কিছু উপকারী, ভালো ও কল্যাণকর তা অর্জন করা। আর যেহেতু সকল অবস্থাই ভালো এবং তা মন্দ নয় তাই বিদ্যমান অবস্থার প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং তা মেনে নিতে হবে। বরং তা সম্ভাব্য সর্বোত্তম অবস্থা বলেই গণ্য করা উচিত।

অন্ধত্ব, বধিরত্ব, জোর-জুলুম, অন্যায়-অবিচার, দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির অস্তিত্ব এবং এগুলোর অকল্যাণ হবার বিষয়টি যেমন অস্বীকার করতে চাই না, তেমনি এগুলোর বরাবরে মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তা অস্বীকার করতেও চাই না। ঠিক তেমনি পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং সমাজে পূর্ণতা আনয়নের ক্ষেত্রে মানুষের যে ভূমিকা আছে তা উপেক্ষা করতেও চাই না।

নিখিল বিশ্বের বিবর্তন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মানুষের জিম্মায় যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা সুষ্ঠুরূপে পালন করার ক্ষেত্রে তার (মানুষের) পর্যায়ক্রমিক পূর্ণতা প্রাপ্তির বিষয়টি আসলে অনুপম সুন্দর বিশ্ব-ব্যবস্থারই অংশবিশেষ। অতএব, এগুলো নিয়ে কোনো কথা নেই। তবে কথা হচ্ছে এ ক্ষেত্রে যে, এ সব কিছু (অন্ধত্ব, জোর-জুলুম, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি) হচ্ছে এক ধরনের অনস্তিত্বমূলক বিষয় এবং অভাব ও অস্তিত্বহীনতা (الفقدانات) এবং এগুলোর অস্তিত্ব আসলে এক ধরনের

ঘাটতি ও শূন্যতা। আর যেহেতু এগুলোই স্বয়ং অস্তিত্বহীনতা বা ঘাটতি ও শূন্যতার উৎস সেহেতু এগুলো হচ্ছে অনিষ্ট ও অমঙ্গল। অপরিহার্য পর্যায়ক্রমিক পূর্ণতা প্রাপ্তি ও বিবর্তনমূলক বিশ্ব-ব্যবস্থায় মানুষের ভূমিকা হচ্ছে ঘাটতি ও শূন্যতা পূরণ এবং এ সব ঘাটতি ও শূন্যতার উৎসের মূলোৎপাটন।

এ বিশ্লেষণটি যদি (পাঠকবর্গের কাছে) গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে তা হলে তা হবে প্রথম পদক্ষেপ ও প্রথম পর্যায়। আর এর ফলে 'কে অমঙ্গল ও অকল্যাণসমূহের স্রষ্টা? কেনো কিছু কিছু জিনিস (অস্তিত্বশীল সত্তা) মঙ্গল (خير) এবং কিছু কিছু জিনিস অমঙ্গল (شرّ)?'– এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের চিন্তা থেকে বের হয়ে যাবে এবং আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কিছু অকল্যাণ আসলে অস্তিত্ব নয়, বরং তা এক ধরনের শূন্যতা ও অস্তিত্বহীনতা। আর সে সাথে দ্বিত্ববাদ (الثنوية) বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, দ্বিত্ববাদ সমগ্র অস্তিত্বজগৎকে দ্বিগুউৎসমূল বিশিষ্ট অর্থাৎ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলে মনে করে।

তবে ঐশ্বরিক ন্যায় এবং উচ্চ পর্যায়ের প্রজ্ঞাগুদর্শনের (الحكمة البالغة) দৃষ্টিতে এখনও আমাদের সামনে আরো একটি পর্যায় আছে যা আমাদের এ পর্যায় অতিক্রম করার পর অবশ্যই পরিক্রমণ করতে হবে।

যেমনভাবে জড় পদার্থ উদ্ভিদ থেকে এবং প্রাণীকুল থেকে উদ্ভিদজগৎ আলাদা তেমনি এ নিখিল বিশ্বে সকল অমঙ্গল পরস্পর পৃথক ও স্বতন্ত্র দু'টি ধারা নয়। এ ধরনের ধারণা করাই ভুল যে, সকল অমঙ্গল হচ্ছে এমন সব অস্তিত্বশীল সত্তা ও বিষয়ের একটি নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র ধারা (শ্রেণি) যেগুলোতে কোন মঙ্গলই (বিদ্যমান) নেই। আর সকল অমঙ্গল হচ্ছে যা কিছু অমঙ্গল আছে সেগুলো থেকে স্বতন্ত্র আরেকটি ধারা। আসলে ভালো ও মন্দকে পরস্পর থেকে পৃথক করাই যায় না। প্রকৃতিতে যেখানেই মন্দত্ব আছে সেখানেই ভালোত্ব ও কল্যাণ আছে। আর যেখানেই ভালোত্ব ও কল্যাণ আছে সেখানেই অমঙ্গল ও মন্দত্ব আছে। প্রকৃতিতে ভালো ও মন্দ পরস্পর মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। এ যেন পরস্পর মিলে যৌগ বা যুগল তৈরি করেছে, তবে তা ঠিক রাসায়নিক যৌগ নয়, বরং তদপেক্ষা গভীর ও সূক্ষ্ম অর্থাৎ অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মিলনে যে যৌগের উদ্ভব হয় তেমনটি।

অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব (الوحود و العدم) বাস্তবজগতে দু'টি পরস্পর ভিন্ন ধারার সৃষ্টি করে না। অনস্তিত্ব হচ্ছে শূন্যতা এবং তা অস্তিত্বের মোকাবিলায় বিশেষ স্থান অধিকার

করে না। তবে প্রকৃতিজগৎ যা হচ্ছে বাস্তবতা (الفعل), সম্ভাবনা (القوة), গতি (الحركة), পূর্ণতা (التكامل), বৈপরীত্য (تضاد) ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বগুসংঘাতের (التزاحم) জগৎ। তাই যেখানেই অস্তিত্ব আছে সেখানে অনস্তিত্বও আছে। যখন আমরা 'অন্ধত্ব' সম্পর্কে কথা বলি তখন আমাদের এরূপ ধারণা করা অনুচিত যে, 'অন্ধত্ব' হলো এক বিশেষ ধরনের বস্তু এবং অনুভবনীয় বাস্তবতা যা অন্ধ ব্যক্তির চোখে বিদ্যমান। না, অন্ধত্ব হচ্ছে দৃষ্টিশক্তির অভাব বা অনুপস্থিতি এবং এর বিশেষ কোনো বাস্তবতা নেই।

ভালো-মন্দ আসলে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মতোই। বরং মূলত ভালো হচ্ছে হুবহু অস্তিত্ব এবং মন্দ (কদর্যতা) হচ্ছে হুবহু অনস্তিত্ব। যেখানেই ভালো ও ভালোত্ব সংক্রান্ত আলোচনার অবতারণা করা হয় সেখানে অবশ্যই এক ধরনের অনস্তিত্ব ও শূন্যতার কথা উত্থাপিত হবে। মন্দ বা কদর্যতা (القبح او السوء) হয় স্বয়ং এক ধরনের অনস্তিত্ব অথবা এমন এক অস্তিত্ব যা এক ধরনের অনস্তিত্ব আনয়ন করে অর্থাৎ তা এমন এক অস্তিত্বময় জিনিস যা স্বয়ং নিজের অস্তিত্বের দিক থেকে ভালো এবং অনস্তিত্ব আনয়ন করে বিধায় তা মন্দ। আর তা শুধু অনস্তিত্ব আনয়ন করে বলেই মন্দ। তবে তা অন্য কোনো দিক থেকে মন্দ নয়। আমরা অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও মৃত্যুকে মন্দ বলে জানি; এগুলো আসলে সত্তাগতভাবেই অনস্তিত্ব। দংশনকারী প্রাণী, হিংস্র পশু, রোগজীবাণু, বিপদাপদসমূহকে 'মন্দ' বলে জানি। এগুলো আসলে সত্তাগতভাবে অনস্তিত্ব নয়; বরং এগুলো হচ্ছে এমন সব অস্তিত্ব যেগুলো অনস্তিত্ব আনয়ন করে।

অজ্ঞতা হচ্ছে জ্ঞানের অভাব বা শূন্যতা। জ্ঞান (العلم) হচ্ছে এক ধরনের বাস্তবতা ও প্রকৃত পূর্ণতা। কিন্তু অজ্ঞতা প্রকৃত বাস্তবতা নয় (অর্থাৎ এর বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই)। যখন আমরা বলব যে, অজ্ঞ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার জ্ঞান নেই তখন তা এ ধরনের অর্থ দেয় না যে, জ্ঞানশূন্যতা বা জ্ঞানের অভাব নামের কোনো বিশেষ গুণের সে অধিকারী যা জ্ঞানী ব্যক্তির নেই। জ্ঞানীরা জ্ঞানার্জনের আগে অজ্ঞ ও মূর্খ থাকেন, যখন তাঁরা জ্ঞান অর্জন করেন তখন তাঁরা কিছু অর্জন করেন। 'অজ্ঞতা' যদি প্রকৃত বাস্তবতা হতো, তা হলে যেহেতু অজ্ঞতার বিলুপ্তির পাশাপাশি জ্ঞানার্জন হয় সেহেতু তা (জ্ঞানার্জন) শুধু একটি গুণের আরেকটি গুণে পরিবর্তন হওয়াই বোঝাত। আর বিষয়টি হতো ঐ জিনিসের মতো যা পূর্বাকৃতি ও গুণ পাল্টে ভিন্ন আকার-আকৃতি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে।

দারিদ্র্য হচ্ছে বস্তুহীনতা ও সম্পদহীনতা তবে তা সম্পদ ও সম্পদের ওপর মালিকানা অর্থে নয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র তার একটি বিশেষ জিনিস নেই যার নাম সম্পদ বা বিত্ত। তবে সে এমন কোনো জিনিসের অধিকারী নয় যার নাম দারিদ্র্য। আর ধনীর মতো দরিদ্রও কোনো সম্পদ ও বিত্তের অধিকারী নয়। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, ধনীরা ধনবান, বিত্তগুবিভবের অধিকারী এবং দরিদ্রের রয়েছে দারিদ্র্য।

মৃত্যুও আসলে হারানো অর্থে, কোনো কিছু প্রাপ্তি অর্থে নয়। তা এজন্য যে, বস্তু বা পদার্থ 'জীবন' নামক গুণটি হারিয়ে জড় পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আসলে এ ক্ষেত্রে তার উন্নতি নয়, বরং অবনতিই সাধিত হয়েছে।

তবে দংশনকারী প্রাণী, হিংস্র পশু, রোগজীবাণু, বন্যা, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ যেহেতু মৃত্যু বা অঙ্গহানির কারণ হয় অথবা শক্তি নাশ করে অথবা বিকাশ ও যোগ্যতাসমূহের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেহেতু এগুলো মন্দ। যদি দংশনকারী প্রাণী মৃত্যু বা রোগের কারণ না হয়, তা হলে তা মন্দ বলে পরিগণিত হবে না। উদ্ভিদের ক্ষতি সাধনকারী পোকা যদি উদ্ভিদ বা ফল নষ্ট হবার কারণ না হয়, তা হলে তা মন্দ বলে গণ্য হবে না। বন্যা ও ভূমিকম্প যদি জানওমালের ক্ষতিসাধন না করে, তা হলে এগুলো মন্দ নয়। ধ্বংস, মৃত্যু ও বিলুপ্তির মধ্যেই শুধু মন্দত্বই নিহিত রয়েছে। আমরা যদি কোনো হিংস্র শিকারী পশু বা প্রাণীকে মন্দ বলে অভিহিত করি তবে তা এ কারণে নয় যে, উক্ত প্রাণী বা পশুর বিশেষ রূপ (الماهية الخاصة) হচ্ছে মন্দ স্বরূপ (الماهية القبيحة)। বরং তা এ কারণে যে, তা অন্য কোনো জীব বা বস্তুর মৃত্যু ও ধ্বংসের কারণ। প্রকৃত প্রস্তাবে যা সত্তাগতভাবে মন্দ তা হচ্ছে জীবনহীনতা (فقدان الحياة)। যদি হিংস্র পশু বা প্রাণী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনো পশু বা প্রাণীর প্রাণনাশের কারণ না হবে, তা হলে তা মন্দ বলে গণ্য হবে না। আর যদি উক্ত হিংস্র পশু বা প্রাণী প্রাণনাশের কারণ হয়, তা হলে তা মন্দ বলে গণ্য হবে। কার্যকারণ ও ফলাফলের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রধানত ঐ সব প্রকৃত অভাব, শূন্যতা ও ঘাট্তি অর্থাৎ দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা আসলে রোগজীবাণু, বন্যা, ভূমিকম্প, যুদ্ধ ইত্যাদির ন্যায় এমন সব বিষয় বা বস্তুর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ যেগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার 'মন্দ' বা 'অনিষ্ট' বিষয় অর্থাৎ সেগুলো হচ্ছে এমন সব অস্তিত্বশীল সত্তা যেগুলো 'অভাব', 'শূন্যতা', 'ঘাটতি' ও বিলুপ্তির উৎস হবার কারণে মন্দ বলে গণ্য।

নৈতিক চারিত্রিক দোষ-ত্রুটির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একই ধরনের। অন্যায়-অত্যাচার মন্দ কাজ। কারণ, অত্যাচারী মজলুমের অধিকারকে ধ্বংস করে। অধিকার হচ্ছে এমন বিষয় যা একটি অস্তিত্বময় সত্তা তা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং তা অবশ্যই তার পাওয়া উচিত। যেমন জ্ঞান হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণতা যা মানবীয় যোগ্যতা দাবী করে এবং তা অর্জন করার দিকে মানুষ ধাবিত হয়। এ কারণেই জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা মানুষের আছে। যদি কারো থেকে শিক্ষা অর্জনের যোগ্যতা কেড়ে নেয়া হয় এবং তাকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় তা হলে তা হবে জুলুম ও মন্দ। কারণ, তা হবে পূর্ণতা অর্জনের পথে বাধা এবং শূন্যতার কারণ। স্বয়ং জালেমের জন্যও জুলুম মন্দ ও অকল্যাণকর এ কারণে যে, তা তার উচ্চ পর্যায়ের যোগ্যতা অর্জনের পরিপন্থী। ক্রোধ ব্যতীত যদি জালেমের এর চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের আর কোনো শক্তি না থাকত, তা হলে তার ক্ষেত্রে জুলুম মন্দ (বলে গণ্য) হতো না, বরং তার ক্ষেত্রে জুলুমের কোনো অর্থই হতো না।

যখন জানা গেল যে, সকল অনিষ্ট, মন্দ ও অমঙ্গল আসলে এক ধরনের অনস্তিত্ব তখন দ্বিত্ববাদের জবাবও স্পষ্ট হয়ে যায়। দ্বিত্ববাদীদের উত্থাপিত সংশয় হচ্ছে এরূপ যে, যেহেতু এ নিখিল বিশ্বে দু'ধরনের অস্তিত্ব (ভালো ও মন্দ) রয়েছে সেহেতু অনিবার্যভাবেই এ বিশ্বজগতের অস্তিত্বেরও দু'ধরনের উৎস বা স্রষ্টা আছে।

এর উত্তর হচ্ছে এই যে, এ বিশ্বজগতে এক ধরনের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই নেই। আর তা হচ্ছে ভালো ও কল্যাণ। সকল মন্দ ও অকল্যাণ আসলে এক ধরনের অনস্তিত্ব। আর অনস্তিত্ব কখনোই মখলূক বা সৃষ্ট হতে পারে না। অনস্তিত্ব হচ্ছে সৃষ্টি না করা। যখন আমরা সূর্যের আলোয় কোনো দণ্ড বা শলাকা ভূমিতে স্থাপন করি তখন ভূমির যে অংশ উক্ত দণ্ড বা শলাকার কারণে সূর্যালোকের দ্বারা উজ্জ্বল হতে পারে নি তা আমরা 'ছায়া' বলে অভিহিত করি। আসলে ছায়া কী? ছায়াই হচ্ছে আঁধার। আর আঁধার আলোর অনস্তিত্ব বা অনুপস্থিতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যখন বলি যে, বিশ্বলোক উজ্জ্বলকারী সূর্য থেকে আলোক বিকিরণ হয় তখন এ প্রশ্ন করা অনুচিত যে, কোথা থেকে ছায়ার বিকিরণ হয়েছে? ছায়া ও অন্ধকার কোথা হতেও বিকিরিত হয় নি। ছায়া ও আঁধারের স্বতন্ত্র কোনো উৎস নেই। আর দার্শনিকদের বক্তব্যও ঠিক এটিই। তাঁরা বলেন : "মন্দ ও অকল্যাণসমূহ সত্তাগতভাবে অর্থাৎ স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত বিষয় (مجعول بالذّات) নয়, বরং সেগুলো হচ্ছে সত্তাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত বিষয়াদিরই অনুগত ও অনুবর্তী (مجعول بالتّبع و العرض)।"

আপনার জিজ্ঞাসা

আপনার জিজ্ঞাসা

মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মহান আল্লাহর জ্ঞান এবং তার (মানুষের) স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা

প্রশ্ন : আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য ও পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহর জ্ঞানের অর্থ কি এই যে, আমাদের কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতাই নেই এবং প্রথম থেকেই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়ে গেছে?

প্রশ্ন সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ : এ প্রশ্নটি আসলে 'জাব্‌র ও ইখতিয়ার' শীর্ষক আলোচনাসমূহের অন্তর্গত। মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদগণ জাব্‌র (বাধ্যতা) সংক্রান্ত আপত্তি অপনোদন করার সময় এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে যে সব আয়াত এবং (মহানবীর) যে সব হাদীসে মহান আল্লাহর পরিচিতি তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, তিনি সকল বস্তু এবং অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, এমনকি মানুষের অন্তরের সবচেয়ে গোপন বিষয় ও অবস্থাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত, সেগুলোই হচ্ছে এ প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপিত হবার কারণ। তাঁর এই জ্ঞান অনাদি অনন্তকাল যাবৎ রয়েছে, আর তা এ অর্থে যে, এমনকি বিশ্বজগৎ এবং সময় বা কালের অস্তিত্ব লাভ করারও বহু আগেই মহান আল্লাহর এ জ্ঞান ছিল। অগণিত আয়াতে এতদর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্য থেকে গুটিকতক আয়াত নিচে উল্লেখ করা হচ্ছে :

أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ যা কিছু আকাশসমূহে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে সেগুলো সম্পর্কে জানেন এবং তিনিই সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত।'

وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

'তিনি হচ্ছেন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান আল্লাহ, তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বিষয় জানেন এবং তোমরা যা করছ সে সম্পর্কে তিনি জানেন।' (সূরা আনআম : ৩)

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

'সেই স্রষ্টা যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি সৃষ্টবস্তুর ভাগ্য সম্পর্কে জ্ঞাত নন যেক্ষেত্রে তিনি হচ্ছেন সূক্ষ্মদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।' (সূরা মুল্‌ক : ১৪)

আবার অন্যদিকে, ইসলাম ও কোরআন মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা ও নির্বাচন ক্ষমতার অধিকারী বলে অভিহিত করে বলেছে যে, সে নিজের ভাগ্য নিজেই নির্বাচন করবে। যে সব আয়াতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতার (ইখতিয়ার) প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো :

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

'নিশ্চয়ই আমরা তাকে (মানুষকে) পথ প্রদর্শন করেছি, এখন হয় সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথটা বেছে নেবে নতুবা কুফ্‌র অর্থাৎ অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করবে।' (সূরা ইনসান : ৩)

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

'আমরা মানুষকে উভয় পথ প্রদর্শন করেছি (সৌভাগ্যের পথ এবং দুভার্গ্যের পথ)।' (সূরা বালাদ : ১০)

মূলত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা (ইখতিয়ার) ব্যতীত দায়িত্ব অর্পণের কোন অর্থই হয় না। যেহেতু ইসলাম বান্দাদের স্কন্ধে বেশ কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে তাদেরকে সেগুলোর ব্যাপারে দায়ী ও জবাবদিহি করতে বাধ্য করেছে সেহেতু এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী বলেই গণ্য করে। আর তা না হলে মানুষের ওপর দায়িত্ব অর্পণ অর্থহীন হয়ে যেত। আর মহান আল্লাহ যিনি নিজেকে 'হাকীম' (প্রজ্ঞাময়) বলে অভিহিত করেছেন তিনি সব ধরনের অযথা ও অর্থহীন (প্রজ্ঞাবর্জিত) কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র ও মুক্ত।

এ দুটি বিষয় পাশাপাশি স্থাপন করার কারণে এক ধরনের আপাত বাহ্যিক স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্যের উদ্ভব হয় যা দুইটি দিক বিশিষ্ট বা একে 'দ্বৈত যুক্তিবাক্য' বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। যদি প্রথম উক্তি (মহান আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকেই পরিব্যপ্ত করে আছে, এমনকি তিনি অনাদি-অনন্তকাল থেকে সকল মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি ও ভাগ্য সম্পর্কে জ্ঞাত) সত্য হয়, তাহলে দ্বিতীয় উক্তি (মানুষ তার নিজ ভবিষ্যতের নির্মাতা) মিথ্যা হবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় উক্তি সত্য হয়, তাহলে প্রথম উক্তি মিথ্যা হবে। কারণ, মহান আল্লাহ সর্ব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত; তাহলে অবশ্যই এ ব্যাপারে তিনি জ্ঞাত যে, আমি ভবিষ্যতে কোন্ ধরনের কর্মসমূহ সম্পাদন করব এবং পরিণতিতে তিনি জানেন যে, আমার চূড়ান্ত ভাগ্য জাহান্নাম না জান্নাত। যদি এ বিষয়টি সত্য হয়, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে, জীবনে আমার সকল কর্মপ্রচেষ্টার কোন অর্থ নেই। কারণ, প্রথম থেকেই জানা আছে যে, আমি কী ধরনের কাজ-কর্ম করব। আর ভাগ্য পরিবর্তনের শক্তি ও ক্ষমতাও আমার নেই। কারণ, আমি যদি আমার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারি তাহলে মহান আল্লাহর জ্ঞান প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

কবি উমর খৈয়াম এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন :

'আমি মদ্যপ, করি মদ্যপান
আর আমার মত মদ্যপ হবে যে জন
তার কাছে সহজ (বৈধ) পরিগণিত হবে আমার মদ্যপান,
অনাদি কাল থেকেই স্রষ্টা জানতেন আমার মদ্যপান
যদি না করি আমি মদ্যপান
তাহলে অজ্ঞতায় পর্যবসিত হবে স্রষ্টার জ্ঞান।'

এ ধরনের বক্তব্যের অনিবার্য যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে জাব্‌র (বাধ্যতা), আর জাব্‌র এমন এক বিষয় যা ইসলামের নীতিমালার ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যাত।

উত্তর : এ গভীর দার্শনিক প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য জাব্‌র ও ইখতিয়ার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির একটি ভূমিকা উপস্থাপন করা প্রয়োজন। ইসলামী কালামশাস্ত্রের ইতিহাসে এ প্রশ্নটি জাব্‌র ও ইখতিয়ার বা ক্বাযা ও ক্বাদ্‌র সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ প্রশ্নের অংশ বলে গণ্য। এ প্রশ্নের বিপরীতে, কতিপয় কালামী মতাদর্শ, যেমন আশআরী (মতবাদ) ও মোতাযিলা মতবাদ প্রান্তিক ও চরম পন্থা অবলম্বন করেছে। আশআরীরা মানুষের ইখতিয়ার অস্বীকার করেছে এবং মোতাযিলারা মানুষের

ইখতিয়ার প্রমাণ করার জন্য মানুষের কর্মকাণ্ডের ওপর মহান আল্লাহর ইচ্ছা এবং ক্বাযা ও ক্বাদরের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। আশআরী কালাম শাস্ত্রবিদদের একাংশ এক মধ্যমপন্থী তত্ত্ব উত্থাপন করেছেন যা 'কাস্‌ব' অর্থাৎ 'অর্জন তত্ত্ব' বলে প্রসিদ্ধ। কিন্তু শিয়া মাযহাব মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইতের জ্ঞানের আলোয় 'আল-আমরু বাইনাল আমরাইন' (দুই প্রান্তীয় বিষয়ের মধ্যবর্তী পন্থা) তত্ত্ব উত্থাপন করেছে। অর্থাৎ না পূর্ণ বাধ্যতা, আর না পূর্ণ স্বাধীনতা; বরং মধ্যবর্তী পন্থাই সঠিক। যদি কেউ এ বিষয়টি সমাধান করতে পারে তখন প্রশ্নটিও আপনা আপনি সমাধান হয়ে যাবে এবং ব্যাপক আলোচনা করারও প্রয়োজন নেই। এ প্রশ্নের জবাবের জন্য দুটি সমাধান পদ্ধতি উত্থাপন করা হয়েছে যা নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

প্রথম পদ্ধতি : বিশ্ব-জগতের কার্যকারণ তন্ত্র সংক্রান্ত মহান আল্লাহর জ্ঞান : শহীদ মুতাহ্‌হারীর মতো দার্শনিকগণ এবং তাঁর পূর্ববর্তী বহু দার্শনিকের পক্ষ হতে এ সমাধান পদ্ধতি পেশ করা হয়েছে এবং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য একটি ভূমিকা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ক. দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, কার্যকারণ তত্ত্ব হচ্ছে এমন এক মূলনীতি যে, আমরা যে জগতেই–ইহজগৎ (দুনিয়া) বা পরজগৎ (আখেরাতে) অথবা জড় জগৎ বা অজড় জগত–এবং যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, এ কার্যকরণ তন্ত্রের বাইরে আমাদের কর্মকাণ্ড করতে পারব না। সকল বিষয় বা ঘটনার (phenomenon) অবশ্যই কারণ থাকতে হবে।

খ. 'কার্যকারণ তত্ত্ব' আসলে এতদর্থে একটি সরল রৈখিক তত্ত্ব বা মূলনীতি যে, এ অনুসারে অস্তিত্বগত পর্যায়ের দৃষ্টিতে ফল বা ক্রিয়ার অবস্থান হচ্ছে ঠিক স্বীয় কারণের পরেই।

গ. দার্শনিকদের পরিভাষা অনুসারে মহান আল্লাহ হচ্ছেন ওয়াজিবুল উজূদ (অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ববান সত্তা), যিনি কার্যকারণ তন্ত্রের শীর্ষে রয়েছেন এবং পরিশেষে যাঁর পবিত্র সত্তায় গিয়ে সমুদয় কারণের পরিসমাপ্তি হয়।

অন্য সকল সৃষ্টির মাঝে মহান আল্লাহ মানুষকে মুখতার অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী সত্তা করেছেন অর্থাৎ তার (মানুষের) জ্ঞান আছে, ইচ্ছাশক্তিও আছে। তাই তার সামনে বিদ্যমান বিভিন্ন পথ থেকে বেছে নেয়ার সুযোগ (option) আছে এবং সে তার নিজস্ব জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে এসব (option)

অধ্যয়ন করবে এবং যেটা তার জন্য উপকারী ও স্বার্থের অনুকূলে হবে সেটা সে সম্পাদন করবে এবং যা তার জন্য ক্ষতিকর তা থেকে সে বিরত থাকবে।

এ ভূমিকার মাধ্যমে উপরিউক্ত প্রশ্ন সংক্রান্ত দার্শনিকদের প্রথম উত্তরটি এভাবে দেয়া হয় : মহান আল্লাহর কেবল নিজ সত্তার এবং নিজ কর্মের প্রতি জ্ঞান আছে। তাঁর কর্ম হচ্ছে কার্যকারণ তন্ত্র অর্থাৎ সেই তন্ত্র যা মানুষের ক্ষেত্রে অবধারিত করে দেয় যে, সে (মানুষ) তার সমুদয় কর্মকাণ্ড স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও নির্বাচন ক্ষমতার ভিত্তিতে সম্পাদন করবে। সুতরাং মহান আল্লাহ মানুষের সমুদয় কর্মকাণ্ড ও নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখেন না। তিনি (আল্লাহ) যে তন্ত্র বা ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন কেবল সে ব্যাপারেই তাঁর জ্ঞান রয়েছে; আর উক্ত তন্ত্র বা ব্যবস্থার একটি গাঠনিক উপাদান বা অংশ হলো মানুষের ইখতিয়ার। এ কারণেই মানুষ নিজ ভাগ্যের নিয়ন্তা। সুতরাং মহান আল্লাহ মানুষের ভাগ্যকে ঠিক এভাবেই জানেন যে, সে তার ইখতিয়ার অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তার ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে। পূর্ব হতে নির্ধারিত কোন ভাগ্য– যা মহান আল্লাহর জানা রয়েছে তা বিদ্যমান নেই। যেহেতু মহান আল্লাহর জ্ঞান অস্তিত্বহীনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না এবং যে কর্মসমূহ মানুষ ভবিষ্যতে নির্বাচন করে অর্থাৎ বাছাই ও মনোনীত করে সম্পাদন করবে সেগুলো অনাদি কালে অস্তিত্বহীনই আছে; কারণ, এ সব কর্মকাণ্ডের কারণের সর্বশেষ অংশ যা হচ্ছে মানুষের নির্বাচন ও বাছাই করার ক্ষমতা তা তখনও (অনাদি) অস্তিত্বহীনই ছিল।

শহীদ মুতাহহারী বলেন : আরেক ভাবে বলা যায় যে, মহান আল্লাহর চিরন্তন জ্ঞান হচ্ছে কার্যকারণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্থাৎ স্ব স্ব বিশেষ কারণসমূহ থেকে ফল বা ক্রিয়াসমূহের উৎপত্তি সংক্রান্ত জ্ঞান। বাস্তব বহির্জগতের কার্যকারণ তন্ত্রে কারণসমূহ এবং কর্মসম্পাদনকারীরা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে : কোন কারণ বা কর্মসম্পাদনকারী প্রাকৃতিক হতে পারে, কোনটি আবার বোধশক্তির অধিকারী অর্থাৎ অনুভূতিসম্পন্ন। কোনটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, আবার কোনটি হচ্ছে অস্বাধীন (অর্থাৎ বাধ্য)। আর জ্ঞান সম্বন্ধীয় তন্ত্রেও অবস্থা ঠিক এ ধরনেরই অর্থাৎ বাস্তব বহির্জগতে প্রত্যেক কর্তা অর্থাৎ কর্মসম্পাদনকারী যেভাবে বিদ্যমান, তা জ্ঞান (সম্বন্ধীয়) জগতেও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান; বরং অবশ্যই বলা উচিত যে, প্রত্যেক কর্মসম্পাদনকারী জ্ঞান সম্বন্ধীয় জগতে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই সে বাস্তব বহির্জগতেও বিদ্যমান।...

মহান আল্লাহর জ্ঞান অবধারিত করে দেয় যে, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী কর্তার কর্ম তার (স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী) কর্তা থেকে এবং অস্বাধীন (বাধ্য) কর্তার

কর্ম অস্বাধীন কর্তা থেকে উদ্ভূত হবে; আর ব্যাপারটা এমন নয় যে, মহান আল্লাহর জ্ঞান অবধারিত করে দেয় যে, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী কর্তা অস্বাধীন (বাধ্য) অথবা কোন অস্বাধীন (বাধ্য) কর্তা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়ে যাবে।... তাই যে চিরন্তন জ্ঞান মানুষের কাজ-কর্মের সাথে সম্পর্কিত তা এতদর্থে যে, তিনি (স্রষ্টা) অনাদি কাল থেকে জানেন যে, কে স্বেচ্ছায় ও পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং কে স্বেচ্ছায় ও পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে অবাধ্য হবে।... আর এটাই হচ্ছে ঐ সব ব্যক্তির বক্তব্যের অর্থ যাঁরা বলেন যে, মানুষ হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী সত্তা (অর্থাৎ মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা সহকারে স্বীয় কার্য ও কর্তব্য সম্পাদন করতে বাধ্য)। অতএব, স্রষ্টার চিরন্তন জ্ঞান জ্ঞান সম্বন্ধীয় জগৎ ও বাস্তব বহির্জগতের কার্য-কারণ তন্ত্রে যাকে মুখতার (ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী) ও স্বাধীন করে সৃষ্টি করা হয়েছে তার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা হরণ করার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করে না।

এ যুক্তির অপনোদন ও সমালোচনা : এ উত্তর পূর্ণভাবে এ প্রশ্ন সংক্রান্ত যাবতীয় দুর্বোধ্যতা দূর করতে সক্ষম নয়। কারণ, এ উত্তরের অনিবার্য অর্থ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহর মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের খুঁটি-নাটি বিষয়ে জ্ঞান নেই; বরং কেবল কার্যকারণ তন্ত্রের জ্ঞান রয়েছে এবং এই তন্ত্র বা ব্যবস্থা মানুষের ক্ষেত্রে এমন যে, সে (মানুষ) তার কর্মকাণ্ডের যাবতীয় খুঁটি-নাটি দিক নিজেই নির্ধারণ করবে। আর এ ধরনের বক্তব্য আসলে মহান আল্লাহর জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে ফেলার অর্থে পর্যবসিত হবে।

আল্লামা মাজলিসি দার্শনিকদের এহেন বক্তব্য ও উক্তির অনিবার্য ফল বা পরিণতি উপলব্ধি করে বলেছেন : 'জেনে রাখুন, শিয়া মাযহাবের জরুরি (অপরিহার্য) বিষয়াদির অন্তর্গত হচ্ছে এ বিষয়টিও যে, মহান আল্লাহ অনাদি কাল থেকেই ছোট-বড় সামগ্রিক ও খুঁটিনাটিসহ যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত এবং তাঁর এ জ্ঞানে কখনোই বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও সাধিত হবে না।'

অথচ এ বিষয়টির সাথে অধিকাংশ দার্শনিকই দ্বিমত প্রকাশ করেছেন এবং এ কারণে তাঁরা খুঁটি-নাটি বিষয়াদি সংক্রান্ত মহান আল্লাহর জ্ঞানকেই অস্বীকার করেছেন।

দ্বিতীয় সমাধান পদ্ধতি : স্রষ্টার সত্তাগত পর্যায়ের জ্ঞান এবং কর্মপর্যায়ের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যকরণ : কতিপয় দার্শনিক ও আরেফ বলেছেন : মহান আল্লাহর জ্ঞান দুই ধরনের : সত্তাগত পর্যায়ের জ্ঞান এবং কর্ম পর্যায়ের জ্ঞান। সত্তাগত পর্যায়ের জ্ঞান

হচ্ছে ইতিবাচক জরুরি জ্ঞান, কিন্তু কর্ম পর্যায়ে তাঁর জ্ঞান হচ্ছে অধস্তন। মনে করুন যে, এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করার আগে (যেভাবে হাদীস ও রেওয়ায়াতে উল্লিখিত আছে) একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে এ বিশ্বজগতের সামগ্রিক লক্ষ্য স্রষ্টার চিরন্তন জ্ঞানে বিদ্যমান ছিল। এই জ্ঞান হচ্ছে সর্বোত্তম তন্ত্র বা ব্যবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞান। অর্থাৎ তিনি অনাদি কাল থেকেই জানতেন যে, বিশ্বজগৎ (অস্তিত্বজগৎ) সৃষ্টি সংক্রান্ত যাবতীয় সকল ধরনের সম্ভাব্য প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে এ ধরনের সৃষ্টি প্রক্রিয়াই হচ্ছে সর্বোত্তম সৃষ্টি প্রক্রিয়া এবং অস্তিত্বশীল সকল সত্তা ঠিক এ পদ্ধতিতেই সর্বোত্তম পূর্ণতা অর্জন করবে। মহান আল্লাহর এ জ্ঞান হচ্ছে ইতিবাচক জরুরি অর্থাৎ এ জ্ঞানের ভিত্তিতেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে। সকল বস্তু ও অস্তিত্বশীল সত্তার সমুদয় বৈশিষ্ট্য ও গুণ মহান আল্লাহর জ্ঞানজগতে সুনির্দিষ্ট আছে এবং এ সব বৈশিষ্ট্যই নির্ধারণ করে যে, প্রতিটি বস্তু বা বিষয় কিসের জন্য সৃষ্টি করা হয়? তন্মধ্যে এ জ্ঞানই নির্ধারণ করে যে, মানুষকে অবশ্যই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী সত্তা হতে হবে, যে তার নিজ বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান, ইচ্ছা ও সচেতনতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ রচনা করবে।

যেহেতু যে কোন জিনিস বা বস্তু বিষয়ক জ্ঞান ঐ বস্তুর (বস্তু সংশ্লিষ্ট) যাবতীয় আবশ্যকীয় উপাদান ও দিক বিষয়ক জ্ঞানও বটে, সেহেতু মহান আল্লাহ অনাদি কাল থেকেই তাঁর সকল মাখলূক (সৃষ্টি), যারা তখনও সৃজিত হয় নি সেগুলোর সকল আবশ্যকীয় উপাদান, দিক, প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞাত। তবে তা কর্ম পর্যায়ে নয়; বরং তাঁর সত্তার পর্যায়ে; কারণ, মহান আল্লাহর কর্মও চিরন্তন। সুতরাং কর্ম পর্যায়ে তিনি জানেন যে, অমুক ব্যক্তি নিজস্ব ইখতিয়ার ও নির্বাচন ক্ষমতা ব্যবহার করে অমুক কাজটা সম্পন্ন করবে এবং তার ভাগ্যটাও কেমন হবে। তবে এ জ্ঞান যদিও অধস্তনমূলক এবং বস্তুর স্বরূপ সংক্রান্ত দৃষ্টিজ্ঞানোত্তর পর্যায়ের অর্থাৎ আরেফদের ভাষায়, পদার্থ ও বস্তুসমূহের ধ্রুব অবয়বে বিদ্যমান, তাই তা কখনোই প্রতিক্রিয়ামূলক হবে না ঠিক এভাবে যে, যে পর্যন্ত জ্ঞান সত্তা বা পদার্থ অস্তিত্ব লাভ না করবে সে পর্যন্ত ঐ জ্ঞান মহান আল্লাহর মাঝে বিদ্যমান থাকবে না। সুতরাং মহান আল্লাহ আমাদের কর্মসমূহের সকল খুঁটি-নাটি দিক সম্পর্কে জ্ঞাত এবং এ কারণেই এমনকি তিনি বেহেশত ও দোযখে সকল মানুষের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত। তবে এ জ্ঞান জাব্‌র অর্থাৎ জোর-জবরদস্তি বা অদৃষ্টবাদের কারণ নয়। কারণ, তা হচ্ছে জ্ঞাত বিষয় বা বস্তুর জ্ঞানের ভিত্তিতে এর সমুদয় বৈশিষ্ট্য ও গুণ সংক্রান্ত দৃষ্টি বা জ্ঞান।

ভাবুন যে, মানুষের জেনেটিক নক্সা বা প্যাটার্ন (genetic pattern) পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁতভাবে বিজ্ঞানীদের হাতে যদি অর্পণ করা হয় এবং তাঁরা কোন শিশুর জিনসমূহ অধ্যয়ন করেন তাহলে তাঁরা শুরু থেকেই নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন যে, ঐ মানব শিশুটি ভবিষ্যতে কোন্ ধরনের জৈবিক, মানসিক, এমনকি চিন্তাগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। আর এসব বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত বিজ্ঞানীদের এ জ্ঞান এ সব বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রে মোটেও হস্তক্ষেপ করবে না ও প্রভাব ফেলবে না। এ সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন একটি যদি এটি হয় যে, এ শিশুটি ভবিষ্যতে (বড় হয়ে) নিজ ইচ্ছা অনুসারে অমুক সময় অমুক কাজটা করবে, তাহলে এতদসংক্রান্ত জ্ঞান কখনোই ঐ ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণের কারণ হবে না। এ বিষয়টি মানুষের কর্মসমূহের সমুদয় খুঁটি-নাটি দিক সংক্রান্ত মহান আল্লাহর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সঠিক ও প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ আমাদের কর্মসমূহের খুঁটি-নাটি দিক সম্পর্কে জ্ঞাত এবং প্রকৃতপক্ষে কোন একভাবে এ কথা সত্য যে, অনাদিকাল থেকেই আমাদের সবার ভাগ্য ও পরিণতি মহান আল্লাহর জ্ঞানে আছে এবং আমরাও পরিণতিতে সেই ভাগ্যই বরণ করব। তবে যে পথ আমরা পরিক্রমণ করছি তা আমরা স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় বাছাই করেছি। আমরা এ পথ পরিক্রমণের মাধ্যমে এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করতে এ ভাগ্যে পরিবর্তন আনয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করি না। আর এটা এজন্য যে, ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ ও সম্ভাবনা আমাদের জন্য প্রস্তুত বলা হয় নি। এর সর্বোত্তম প্রমাণ হচ্ছে আমাদের বিবেক ও অন্তরের দিকে প্রত্যাবর্তন। আমরা যদি কোন পাপ করা বা তা ত্যাগ করার মতো অবস্থার সম্মুখীন হই এবং তখন যদি আমরা আমাদের বিবেকের শরণাপন্ন হই তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, ঐ পাপটা না করার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ অনাদি কাল থেকেই জানেন যে, অবশেষে আমরা তা সম্পাদন অথবা ত্যাগ করাটাই বেছে নেব। এ কারণেই মহান আল্লাহ অনাদি কাল থেকেই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও নির্বাচন করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ না করেই আমাদের ভাগ্য ও পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত।

(বিস্তারিত অধ্যয়ন ও জানার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থ ও সূত্রসমূহ দ্রষ্টব্য : শহীদ আয়াতুল্লাহ মুতাহ্হারীর রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮; আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী প্রণীত ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও মাযহাবের অভিধান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩।)

বিশেষ নিবন্ধ

ইমাম খোমেইনী ও ইসলামী বিপ্লব

ইমাম খোমেইনী ও ইসলামী বিপ্লব

মো. আবু ওয়াসি

ইমাম খোমেইনী (রহ.) ছিলেন বর্তমান বিশ্বের ইসলামী পুনর্জাগরণের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি এমন এক সফল বিপ্লবের নায়ক যে বিপ্লবের ঢেউ লাগে সারা বিশ্বে। এ বিপ্লব সারা বিশ্বের মুমিনদের কাছে সত্যিকার ইসলামকে তুলে ধরে। দলে দলে মানুষ সত্য পথের সন্ধান পেয়ে এর ছায়ায় আশ্রয় নেয়।

ইমাম খোমেইনী (রহ.) ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে ২২৫ কি.মি. দক্ষিণে খোমেইন শহরে ১৯০১ সালের ২৩ অক্টোবর (১৩২০ হিজরির ২০ জমাদিউস সানি) এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ মুস্তাফা মুসাভী একজন বিশিষ্ট মুজতাহিদ ছিলেন। ভূ-স্বামীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার কারণে তাঁকে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইমাম খোমেইনীর প্রপিতামহ সাইয়্যেদ আলী দীন শাহ কাশ্মীরের একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তাঁর মাতামহ আয়াতুল্লাহ্ মির্জা আহমদ ছিলেন একজন বিখ্যাত মুজতাহিদ।

ইমামের শিশুকালেই তাঁর পিতা শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার কনিষ্ঠ সন্তান। তিনি তাঁর ফুফু ও বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। তাঁর বড় ভাই আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ মুর্তাজাও একজন প্রাজ্ঞ ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন।

ইমাম খোমেইনী ছোটবেলা থেকেই প্রখর বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। মাত্র সাত বছর বয়সে সম্পূর্ণ কোরআন পড়া শেষ করে আরবি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এরপর বড় ভাইয়ের কাছে তিনি যুক্তিবিদ্যা, আরবি ব্যাকরণ শিক্ষালাভ করেন।

১৯ বছর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য আরাকে গমন করেন। সেখানে আয়াতুল্লাহ্ গোলপায়গানীর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। এক বছর পর আয়াতুল্লাহ্ হায়েরীর সাথে কোমে চলে আসেন। সেখানে ১৫ বছর তিনি আয়াতুল্লাহ্ হায়েরীর দারসে খারেযে

যোগ দেন। তখন তিনি নিজেও বিভিন্ন বিষয়, যেমন আইনশাস্ত্র, ইরফান, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষাদান করতেন।

আয়াতুল্লাহ্ হায়েরীর ইন্তেকালের পর কোমে আসেন আয়াতুল্লাহ্ বরুজারদী। ইমাম তাঁর ক্লাসে যোগ দিতেন। তিনি আয়াতুল্লাহ্ আলী আকবর ইয়াযদীর কাছে জ্যোতির্বিদ্যা এবং মরহুম শায়খ মুহাম্মদ আলী শাহবাদীর কাছে দর্শন ও রহস্যজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন।

এভাবে অল্প সময়েই মধ্যেই তিনি ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী আইন, হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্র, রহস্যজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে একজন আসামান্য পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। এর পাশাপাশি বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানেও তিনি বেশ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি এসবের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার চর্চা করেন। রিয়াজত, মুশাহাদা, মোরাকাবার মাধ্যমে তিনি তাযকীয়ায়ে নফসের উঁচু স্তরে পৌঁছে যান। তিনি ২৭ বছর বয়সে দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

ইরানের তৎকালীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি

রাস্তার মোড়ে মোড়ে শুঁড়িখানা ও নাইটক্লাবের আড্ডা প্যারিস-নিউইয়র্ককেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নারীদেরকে আধুনিকতার নামে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এ সবের সমর্থনে একটা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি গড়ে তোলা হয়েছিল। সমাজের সর্বত্র ইসলামী মূল্যবোধের পরিবর্তে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছিল।

অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আমেরিকা-বৃটেনের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। ইরানের সশস্ত্র বাহিনী মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। শাহের গুপ্তপুলিশ সাভাকের প্রশিক্ষণ হতো ইসরাইলে। তারা শত শত মানুষকে হত্যা করে অথবা চিরতরে পঙ্গু করে দেয়। জনগণের টাকায় অঢেল অস্ত্র আমদানী করা হয়। ইরানকে মধ্য এশিয়ায় আমেরিকার পদলেহী একটি সামরিক শক্তি হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। তেল সম্পদের বিরাট লভ্যাংশ বৃটেন ও মার্কিন তেল কোম্পানির হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল।

রাজবংশ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন

১৮৯২ সালে তামাকবিরোধী আন্দোলন দিয়ে সর্বপ্রথম রাজবংশের বিরুদ্ধে জনগণ সোচ্চার হয়। এতে নেতৃত্ব দেন আলেমরা। মীর্যা হাসান সিরাজী তামাক বর্জনের ফতোয়া দেন। ১৯০৩ সালে কোরআন ভিত্তিক সংবিধান রচনার দাবিতে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে তেলসম্পদ জাতীয়করণের আন্দোলন হয়। ১৯৫৩ সালে পার্লামেন্টে জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী ড. মোসাদ্দেক তেলসম্পদ জাতীয়করণের বিল উত্থাপন করেন। পার্লামেন্টে বিল পাস হয়। মোহাম্মদ রেজা ইরান থেকে পলায়ন করে। বৃটিশরা এ অবস্থায় ইরানের উপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না জেনে ইরানের ভার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দেয়। সিআইএ দ্বারা পরিচালিত সামরিক অভ্যুত্থানে মোসাদ্দেক সরকারের পতন ঘটে এবং মোহাম্মদ রেজা আবার ইরানে ফিরে এসে ক্ষমতা গ্রহণ করে।

এ সময়কালের মধ্যে মীর্যা হাসান সিরাজী, সাইয়্যেদ মুহাম্মদ বিহবিহানী, সাইয়্যেদ তাবতাবায়ী, শেখ ফাজলুল্লাহ্ নূরী, আয়াতুল্লাহ্ কাশানী, আয়াতুল্লাহ্ বুরুজারদী প্রমুখ খ্যাতনামা আলেম এ সব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

ইমামের বিপ্লব

১৯৪১ সালে কাশফ আল আসরার (রহস্য উন্মোচন) নামক গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে ইমাম খোমেইনী নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের যাত্রা শুরু করেন। এতে তিনি বলেন, "একমাত্র ধর্মই মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাধের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত যারা ইরানের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার, তারা মেকী ধর্মে বিশ্বাস করেন অথবা তাদের আদৌ কোন ধর্মবিশ্বাস নেই।"

"স্বৈরতান্ত্রিক শাসক দস্যু রেজা খানের ইস্যুকৃত নির্দেশাবলীর আদৌ কোন মূল্য নেই। তার পার্লামেন্টে গৃহীত আইনগুলো মুছে ফেলতে হবে, পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ঐ মূর্খ সৈনিকের মগজ থেকে যে সব অর্থহীন শব্দ বেড়িয়ে এসেছে সব নির্মূল করতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহ্র আইন টিকে থাকবে এবং তা এ কালের ধ্বংসকে প্রতিহত করবে।"

ইমাম খোমেইনী তাঁর ছাত্রদের আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং রূহানী শক্তি ও নৈতিকতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিতেন। পরবর্তীতে তিনি নীতিশাস্ত্র এবং আত্মিক জ্ঞানের ক্লাস চালু করেন। তাঁর ক্লাসে শত শত ছাত্র, এমনকি মুজতাহিদরাও যোগ দিতেন।

তাঁর জনপ্রিয়তা এবং তাঁর ক্লাসে বিপুল সংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতি রেজা খানের নিরাপত্তা পুলিশকে আতঙ্কিত করে এবং তারা লোকদেরকে এ থেকে নিবৃত্ত প্রয়াস চালায়। এমনকি ক্লাসটি বন্ধ করার জন্য হুমকি দেয়া হয়।

কোমের ফায়জিয়া মাদ্রাসা থেকে কোমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাজী মোল্লা সাদিক মাদ্রাসায় নীতিশাস্ত্রের ক্লাসগুলো স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত পুলিশ এ চাপ অব্যাহত রাখে। রেজা শাহের পতন ও নির্বাসনের আগ পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। এরপর আবার ফায়জিয়া মাদ্রাসায় ক্লাস চালু হয়। এ সব ক্লাসের বক্তৃতা পরবর্তীতে 'নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' ও 'আল জিহাদুল আকবার' নামে সংকলিত হয়।

তাঁর ক্লাসগুলো একই উপকারী যে প্রায় পাঁচম মুজতাহিদ হওযার সৌভাগ্য লাভ করে। অনেকেই গুরত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হন। তাঁদের মধ্যে বর্তমান রাহবার আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী এবং রাফসানজানীর অন্যতম।

ইমাম খোমেইনীর রাজনৈতিক উত্থানের পেছনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্যের পাশাপাশি দু'টি বিষয় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রথম বিষয় হলো ১৯২২ সালে শায়খ আবদুল করীম হায়েরী কর্তৃক কোমের ধর্মতত্ত্ব কেন্দ্রকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। আর দ্বিতীয়টি হলো আয়াতুল্লাহ্ বরুজারদীর অবদান। তিনি আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ের শক্তিশালী কেন্দ্র হিসাবে কোমকে গড়ে তোলার কাজে মনোযোগ দেন। তিনি সারা ইরানে খুম্‌স ও অন্যান্য ধর্মীয় বিধান বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর ফলে কোমের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়।

আয়াতুল্লাহ্ বরুজারদী ইরানী আলেমগণের সর্বজনগ্রাহ্য নেতা ছিলেন। ১৯৬২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর আলেমগণ ইমাম খোমেইনীকে তাঁদের নেতৃত্বে বরণ করে নেন। এ সময়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যাতে ১৯৬৩ সালে ৫ জুন গণ-অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

সমাজতন্ত্রের মোকাবিলা এবং তাঁবেদার দেশগুলোতে মার্কিন পণ্যের বাজার সৃষ্টির লক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচী চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এরকমই এক সংস্কার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল মহিলাদের ভোটাধিকার দান এবং প্রাদেশিক সমিতিসমূহের জন্য কোরআন নিয়ে শপথের শর্তের বিলোপ সাধন। এটি ছিল ১৯৬২ সালের কথা।

যেখানে পুরুষরাই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারত না সেখানে মহিলাদের ভোটাধিকার নিছক একটা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইমাম এসব বিষয়ে প্রতিবাদ জানান এবং আলেমরাও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। সরকার প্রতিবাদের মুখে কোরআন নিয়ে শপথ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি বাতিল করে। কিন্তু ১৯৬৩ সালে ৯ জানুয়ারী আবার ছয় দফা সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং এ কর্মসূচী অনুমোদনের জন্য গণভোটের আয়োজন করে। একে 'শ্বেত বিপ্লব' বা 'শাহ ও জনতার বিপ্লব' নাম দেয়া হয়। বিপ্লবীরা একে শ্বেত বিপ্লব বলতেন এ অর্থে যে, তা হোয়াইট হাউসে জন্মলাভ করেছিল।

ইমাম খোমেইনী ভোট বর্জনের ডাক দেন। জনগণ ভোটদান হতে বিরত থাকে। সে বছরই ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ইমাম শাসকগোষ্ঠীর বেআইনী ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। ইমামের নেতৃত্বে ইরানের ইসলামী উম্মাহ্‌র প্রতিরোধে শাহ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে।

১৯৬৩ সালে আলেমরা ঘোষণা করেন যে, এ বছর সপ্তাহব্যাপী নওরোজ পালন করা উচিত নয়। কারণ, নববর্ষের ২য় দিন ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী। জনগণ এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

১৯৬৩ সালের ২২ মার্চ নওরোজের দ্বিতীয় দিন ফায়জিয়া মাদ্রাসায় ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে হাজার হাজার লোক অংশগ্রহণ করে। শাহের লোকেরা এ অনুষ্ঠানে আক্রমণ করে অনেককে হত্যা ও আহত করে। শুধু তাই নয় কয়েকদিন পর যারা আহত হয়ে হাসপাতালে ছিল তাদেরকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়।

এ ঘটনার চল্লিশতম দিনে সারা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়। জনতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এর পরপরই আশুরা সমাগত হয়। সাভাক বাহিনী হুকুম

দেয় যে, ফায়জিয়া মাদ্রাসায় ইমামের বক্তৃতা দেয়া চলবে না। ইমাম এ অন্যায় আদেশ উপেক্ষা করে আশুরার বিকেলেই মাদ্রাসা ফায়জিয়ায় পৌঁছান। ইমাম তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি যে, তারা ইসলাম ও ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরোধী। ইসরাইল আমদের পবিত্র ঐশী গ্রন্থ আল কোরআনকে হেয় করতে চায় এবং ধর্মীয় নেতৃত্বকে নির্মূল করতে চায়। ইসরাইল আমাদের অর্থনীতি, ব্যবসা ও কৃষিকে পাকাপোক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।"

ইমামের ভাষণে জনগণ ক্রোধে ফেটে পড়ে। রাতে ইমামকে গ্রেফতার করা হয়। মুহূর্তে খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জনতা স্লোগান তোলে : হয় খোমেইনী, না হয় মৃত্যু। তেহরানে বিশাল মিছিল হয়। বিশ্ববিদ্যালয়, দোকানপাট বন্ধ থাকে। সারা দেশে ধর্মঘট পালিত হয়।

১৯৬৩ সালের ৫ জুন গণবিক্ষোভে গুলি বর্ষণ করলে তেহরানে ১৫০০০, কোমে ৪০০ লোক শাহাদাত বরণ করেন। জনগণের দাবির মুখে ১৯৬৪ সালের ৭ এপ্রিল শাহ ইমামকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

ক্যাপিটিউলেশন আইন

১৯৬৪ সালের ১৩ অক্টোবর ইরানী পার্লামেন্টে ইরানে বসবাসরত মার্কিন নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আইন পাশ করা হয়। এ আইনে মার্কিন নাগরিকদের বিচার করার কোন ক্ষমতা ইরান সরকারের থাকবে না এবং তাদের বিচার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

ইমাম এর বিরোধিতা করে বক্তৃতা রাখেন। তিনি বলেন, "এহেন অপমানের প্রতিবাদ করার ভার এখন ইসলামী মুবাল্লিগ ও বক্তাদের উপরই ন্যস্ত। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে দেশের স্বাধীনতার জন্য কলম ধরতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে। রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কদের উচিত পার্লামেন্টে গৃহীত সিদ্ধান্তের পেছনে কি রহস্য নিহিত রয়েছে, সে সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা। এ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি সর্বসম্মত নীতি গ্রহণ করতে হবে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ইসলাম ও কোরআনের গৌরব বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং একই সাথে মুসলমানদের সমর্থনে কাজ করে যাওয়া উচিত।"

ইমাম সেনাবাহিনীকে জেগে উঠে শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করার আহ্বান জানান। শাহ বুঝতে পরল যতদিন ইমাম দেশে আছেন ততদিন জনগণের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা যাবে না। তাই আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য ইমামকে নির্বাসনে পাঠানোর কথা ভাবল। ১৯৬৪ সালের ৪ নভেম্বর ইমামকে কোম থেকে গ্রেফতার করে তুরস্কে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সৈন্যরা ধর্মীয় নেতাদের বাড়ি ঘেরাও করে। ইমাম খোমেইনীর জ্যেষ্ঠপুত্র মোস্তফা খোমেইনীও গ্রেফতার হলেন। দু'মাস পর তাঁকেও তুরস্কে নির্বাসন দেয়া হয়।

১৯৬৫ সালের অক্টোবরে তুরস্ক সরকার তাঁকে ইরাকের নাজাফে প্রেরণ করে। সেখানে তিনি ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি সেখান থেকে তাঁর বাণী ইরানে প্রেরণ করতেন এবং আলেমরা তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতেন।

ইমাম খোমেইনীকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোস্তফা খোমেইনীকে ১৯৭৭ সালের ২৩ অক্টোবর বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

১৯৭৮ সালের ৭ জানুয়ারী ইমাম খোমেইনীর মর্যাদা নষ্ট করে পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইমামকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং তিনি বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার দালাল বলে উল্লেখ করা হয়।

এর প্রতিবাদে কোমে বিক্ষোভ হয় এবং ২০০ লোক শাহাদাত বরণ করেন। কোমের শহীদদের স্মরণে তাবরীজে বিক্ষোভ হয়। এতে ৫০০ জন শহীদ হন। এরপর ইরানের প্রতিটি শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়। শত শত লোক শহীদ হন।

১৯৭৮ সালের মুহররম মাসে লাখ লাখ মানুষ তেহরানের রাস্তায় নেমে আসে। নিরস্ত্র জনতা কাফনের কাপড় পড়ে মেশিনগান সজ্জিত সেনাবাহিনীর সামনে ছুটে যেতে থাকে। ৮ সেপ্টেম্বর ৫০০০ লোক শাহাদাত বরণ করেন।

অক্টোবর মাসে ইমামকে ইরাক থেকে বহিষ্কার করা হয়। যদিও ইমাম কোন মুসলিম দেশে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোন মুসলিম দেশ ইমামকে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। তাই তিনি ফ্রান্সের প্যারিসে চলে যান।

সেখান থেকে ইমামের বাণী রেকর্ড করে ইরানে প্রেরণ করা হতো। তেহরানের বহু লোক ফোনে সরাসরি তাঁর কথা রেকর্ড করে রাখতেন। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের ছাত্রদের মাধ্যমে গ্রাম-গ্রামান্তরে তা পৌঁছে দিতেন।

১৯৭৮ সালের ৪ নভেম্বর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইমামকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে মিছিল করে। শাহের বাহিনী এ মিছিলের উপর গুলি করলে ৬৫ জন ছাত্র শহীদ হয়।

এরপর মুহররম ৯ ও ১০ তারিখ (১৯৭৯) পুনরায় বিক্ষোভ হয়। ইমাম তাঁর প্রেরিত বাণীতে বলেন : 'মুহররম হলো তরবারির উপর রক্তের বিজয়ের মাস'।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সারা দেশে কার্ফু ঘোষণা করা হয়। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী বুঝতে পারে যে, কার্ফু মানা হবে না। তাই তা প্রত্যাহার করা হয়। প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মিছিল করে উত্তর তেহরানের দিকে ধাবিত হয়। তারা শাসকদের ভবনগুলোতে তালা লাগিয়ে দেয়। শাহ বুঝতে পারে আর টিকে থাকা সম্ভব নয়। সে কট্টর ধর্মবিরোধী নেতা শাপুর বখতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে। সে শাহকে নিরাপদে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। শাহ পালিয়ে যাবার সময় বলে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু দিন বেড়িয়ে আসি।

শাহ আমেরিকায় কিছুদিন অবস্থান করে। আমেরিকার সরকার তার নিরাপত্তার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করে। সে মিশরে আনোয়ার সাদাতের আশ্রয় নেয় এবং সেখানেই মারা যায়।

ইমামকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য জনগণ বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে। কিন্তু শাপুর বখতিয়ার এ দাবিকে উপেক্ষা করে। ইমাম বখতিয়ারের অনুমতি ছাড়াই দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। বিমান বন্দরে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। ইমামকে এ ব্যাপারে অবহিত করার পরও তিনি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট ফ্লাইটে দেশে ফেরার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

শাপুর বখতিয়ার বিমান বন্দর বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেও বিমান বন্দরের কর্মচারীরা তা উপেক্ষা করে ইমামের বিমান অবতরণের ব্যবস্থা করে দেয়। এভাবে ১৯৭৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারী ইমাম বিজয়ীর বেশে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় ৬০ লক্ষ লোক তাঁকে অর্ভ্যর্থনা জানায়।

ইমাম প্রথমেই বিপ্লবের শহীদদের কবরস্থান বেহেশতে যাহ্‌রায় যান এবং সেখানে বক্তব্য রাখেন। তিনি রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও মজলিশকে অবৈধ ঘোষণা করেন।

তিনি সেনাবাহিনীকে জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোণার আহ্বান জানান। তাঁদেরকে স্বাধীনতার দিকে উৎসাহিত করেন।

তিনি মেহেদী বাজারগানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। বাজারগান অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। দেশে দু'টি সরকার অস্তিত্ব লাভ করে।

সেনাবাহিনীর সদস্যদের দলত্যাগের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১০ ফেব্রুয়ারী বিমান বাহিনীর ক্যাডেটরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেনাবাহিনীর প্রধান দেশে সামরিক আইন জারির চিন্তা করে। ইমাম সামরিক আইন উপেক্ষা করে জনগণকে রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানান। জনতা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে হামলা চালাতে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর অফিস, রেডিও স্টেশন, টেলিভিশন স্টেশন, সংসদ ভবন, সাভাব বাহিনীর সদর দফতর ও নির্যাতন কেন্দ্রগুলোতে গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রায় ৮০০ লোক নিহত হয়। জনগণের প্রবল চাপে শাপুর বখতিয়ার রাতের আঁধারে পালিয়ে যায় এবং ১১ ফেব্রুয়ারী বিপ্লব পূর্ণ সফলতা লাভ করে।

১৯৭৯ সালের ৩০ মার্চ গণভোট হয় এবং দেশের ৯৮.২% জনগণ ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সপক্ষে ভোটদান করে। ১ এপ্রিল ইরানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।

বিপ্লবের পরপরই খুব কম সময়েই মধ্যেই আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মোতাহ্হারী, আয়াতুল্লাহ্ তালেকানী, আয়াতুল্লাহ্ বেহেশতীসহ বিপ্লবের প্রথম কাতারের ৭৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে শহীদ করা হয়। বোমা বিস্ফোরণে শহীদ করা হয় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী রাজাই ও প্রধানমন্ত্রী ড. জাভেদ বাহোনারকে। আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীকেও হত্যার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যে বিপ্লব ধ্বংসের জন্য এত প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে আজোও তা টিকে আছে এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে এ বিপ্লবের পতাকা তুলে দেয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে ইনশাল্লাহ্।

অন্যান্য আলেমদের তুলনায় তাঁর সফলতা

ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর সফলতার কারণ ছিল ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশের পূর্বে ফকীহ-মুজতাহিদের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। এ

বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৬৩ সালের পূর্বে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ না হওয়ার পেছনে প্রকৃত কারণ ছিল এটাই। কেননা এ সময় তিনি আলেম সমাজের মধ্যে এক চিন্তাগত নীরব বিপ্লব সাধন করছিলেন।

ধর্মতত্ত্ববিদদের ধারণা ছিল ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে ফকীহ-আলেমগণ সমাজের ছোট-খাট সংস্কার করতে পারেন; অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মজলুম মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন। তাঁদের কাজ হলো বড় জোর ধর্মীয় ফতোয়া ও সংগ্রামের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে কিছুটা সংযমী করা, দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা– এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু ইমাম খোমেইনী (রহ.) বুঝিয়ে দেন : ইমাম মাহ্দী (আ.) বিশ্ব-বিপ্লবের নায়ক হবেন, সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের পূর্বে দেশে দেশে ফকীহ আলেমদের উচিত তাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং কোরআনের আইন জারীর চেষ্টা করা।

তাঁর কথা ছিল সাম্রাজ্যবাদীরা এ ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে ছড়িয়েছে যে, ইসলামে সরকার গঠনের বাধ্য-বাধকতা নেই। ইসলামের বিধান তো রয়েছে, সরকার না হলেও ইসলামী শরিয়ত চলতে থাকবে। তাই ইসলামী হুকুমত কায়েমের প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, "নবী (সা.) যে রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তাঁর পর তাকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে নেয়ার জন্য খলীফার পদ নির্দিষ্ট করেছেন। খলীফার কাজ কি শুধু আইন বর্ণনা-বিশ্লেষণ ও প্রচার করার জন্য? তাহলে তো খলীফার দরকার নেই। খলীফার পদ আইন কার্যকর করা। কার্যকর নির্বাহী ব্যবস্থা না থাকলে আইন কার্যকর হতে পারে না। আইন কার্যকর করার জন্য নির্বাহী কর্তৃত্ব একান্ত আবশ্যক।"

তিনি বলেন, "রাজনীতি ও ধর্ম আলাদা নয়। রাসূলের সময় কি তা ছিল? খোলাফায়ে রাশেদীন বা ইমাম আলী (আ.)-এর সময় কি তা ছিল?"

আসলে সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছে মানুষের জীবন থেকে ইসলামকে নির্বাসিত করতে, বাস্তব জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধকে নিঃশেষ করতে এবং ফলশ্রুতিতে জনগণের সাথে আলেমদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা আলেমরাই ইসলামের প্রকৃত বিপ্লবী রূপের সাথে পরিচিত এবং তারাই জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে

মুক্ত রাখতে সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছে। ধর্ম-রাজনীতি পৃথক হলে জনগণের উপর আলেমদের প্রভাব কমত, সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বাড়ত, আর তারা ধন-সম্পদ লুটে নিতে পারত।

তিনি বলেন, "শুধু নামায, রোযা, যিকির নিয়ে ব্যস্ত থাকলে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা পরিত্যাগ করলে তারা কখনই আমাদের সাথে বিবাদ বাধাতে আসবে না। সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ না করে শুধু জ্ঞান শিক্ষাদান, আইন-কানুন পাঠ করলে তাদের সাথে সংঘর্ষের কোন আশংকা থাকবে না। নামায নিয়ে তো ওদের মাথা ব্যথা নেই। ওরা চায় খনিজ সম্পদ।"

তিনি বলেন, "গোটা জগৎটাই তো রাজনৈতিক। এখানে রাজনীতি না করলে টিকে থাকাই তো সম্ভব নয়।"

ইমাম বলেন, "ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর অবর্তমানে আইন সংক্রান্ত জ্ঞান এবং ন্যায়পরায়ণ মানুষকেই শাসক নিয়োগ করতে হবে। এরকম প্রচুর আলেম পাওয়া যাবে। এরা সকলে এক হয়ে কাজের সংকল্প করলে একটি তুলনাহীন বিশ্বজনীন ন্যায়বাদী রাষ্ট্র কায়েম করা খুব সহজেই সম্ভব হবে।"

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহের স্বরূপ উদ্ঘাটন

ইসলামপন্থী দল ও আন্দোলনগুলোর নেতারা মনে করতেন নাস্তিক সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে অস্তিক মার্কিনীরা ভালো এবং তাদের দিক থেকে ইসলামের উপর আঘাত আসবে দেরীতে বা নাস্তিকদের বিরুদ্ধে তাদের সমর্থন লাভ করা যাবে।

কিন্তু ইমাম খোমেইনী বুঝেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিত মোটেই শক্তিশালী নয়; বরং অতি শীঘ্রই কমিউনিজমের পতন ঘটবে। আর এ জন্যই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'শয়তানে বোযোর্গ' বা 'বড় শয়তান' আখ্যা দিয়েছিলেন। একই সাথে তিনি জানতেন যে, সাম্রাজ্যবাদের অভিজ্ঞতার আলোকে সব সময়ই গ্রেট বৃটেন মার্কিনীদের পদলেহী হয়ে থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে যাবে। এজন্যই তিনি গ্রেট বৃটেনকে 'শয়তানে পীর' বা 'বুড়ো শয়তান' নামে অভিহিত করেছিলেন।

রাজনৈতিক দর্শন

ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর চেষ্টার লক্ষ্য ছিল ধর্মী রাষ্ট্র গঠন এবং রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যকার তথাকথিত ব্যবধান ঘুচানো। তিনি এমন এক সময় এ দর্শন ব্যক্ত করেছিলেন যখন সারা বিশ্বে প্রচার চালানো হচ্ছিল যে, ধর্মীয় রাষ্ট্রের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং তা মধ্যযুগীয় একটি দর্শন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু ইমাম খোমেইনী এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত করে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েম করেন যা এখনও বিদ্যমান।

মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্র্য সৃষ্টি

মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতির মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য ইমাম মুসলমানদের ঐক্যের উপর জোর দিতেন। রাসূলের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে যেন মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয় সেজন্য তিনি ১২ থেকে ১৭ রবিউল আউয়াল 'ঐক্য সপ্তাহ' পালনের আহ্বান জানান।

ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত মসজিদুল আকসাকে মুক্ত করার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে যেন মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠে সেজন্য তিনি রমযান মাসের শেষ শুক্রবার 'আল কুদ্‌স' দিবস পালন করার আহ্বান জানান।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন

ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন থেকে আমাদের জন্য অনেক কিছুই শিক্ষণীয় আছে।

ইমাম খোমেইনী খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তাঁর ঘরে একটি টেলিভিশন, একটি রেডিও, একটি পড়ার বই এবং অনেক বই-পুস্তক ছিল। কোন বিলাস সামগ্রী তাঁর বাড়িতে ছিল না।

তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের খুব ভালোবাসতেন। স্ত্রীকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। একই সাথে খাবার খেতেন। স্ত্রীর জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতেন। স্ত্রীকে পছন্দমতো জিনিস কেনার, বান্ধবী ও পরিচিতজনদের সাথে মেলামেশা করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। শুধু এতটুকু বলেছিলেন যেন তিনি ধর্মের অনুশাসন

মেনে চলেন। অসুস্থাবস্থায় অথবা কোন জায়গায় সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীর নিকট হতে ক্ষমা চাইতেন এবং তিনি সন্তুষ্ট আছেন কিনা জানতে চাইতেন। স্ত্রীকে উত্তম আসনে বসাতেন। ঘরে থাকা অবস্থায় বাসনপত্র, কাপড়-চোপড় নিজে ধুতেন। তাই যখন তিনি ঘরের বাইরে থাকতেন তখন তাঁর স্ত্রী ধোয়ার কাজ সেরে ফেলতেন।

তাঁর এক মেয়ে একবার তাঁকে স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিনি আমার জন্য যতটুকু আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন এবং যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা অন্য কেউ করতে পারেনি। তুমি যদি এ মহিলার মতো হয়ে থাক তাহলে তোমার জীবনসঙ্গীও তোমাকে এভাবেই ভালোবাসবে।

তিনি সন্তানদের প্রতি খুবই স্নেহশীল ছিলেন। মাঝে মাঝে সন্তানদের অগোচরে রান্নাঘরে ঢুকে চা বানিয়ে আনতেন যা দেখে তাঁর সন্তানরা লজ্জা পেতেন। ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীদের সাথে গল্প করতেন। পরিবারের সদস্যদের সমস্যা শুনে সেগুলোর সমাধানের ব্যবস্থা করতেন।

তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন এবং যতদূর সম্ভব অন্যদের সাহায্য নিতেন না। কখনো কলম বা অন্য কোন জিনিস উপর তলা হতে আনতে হলে তিনি নিজেই গিয়ে তা নিয়ে আসতেন। কাউকে তা আনার জন্য হুকুম করতেন না।

গৃহের খাদেমদের প্রতিও তিনি একই আচরণ করতেন যা তিনি নিজ সন্তানদের সাথে করতেন। খাদেমদের কাজে সাহায্য করতেন। কোন কাজকেই তিনি ছোট মনে করতেন না।

একবার ইমাম তাঁর আরো কতিপয় সঙ্গী-সাথীসহ মাসহাদে ইমাম রেযা (আ.)-এর মাযার যিয়ারত করতে যান। সেখানে তাঁরা একটি হোটেলে অবস্থান করেন। ইমাম মাযার যিয়ারত করে তাড়াতাড়ি নিজের রুমে চলে আসেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা একটু অবাক হন যে, ইমাম মাযার যিয়ারত এত সংক্ষিপ্ত করলেন কেন। কিন্তু যখন তাঁরা হোটেলে ফিরে আসেন তখন বুঝতে পারেন ইমাম বাথরুমগুলো পরিষ্কার করার জন্যই তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলেন।

অপচয়ের ব্যাপারে খুবই সাবধান ছিলেন। অতিরিক্ত বাতি জ্বালানো থাকলে তিনি নিজেই গিয়ে সেগুলো নিভিয়ে দিতেন।

(৪ জুন ইসলামী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা ও মহান নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা সাইয়্যেদ রুহুল্লাহ্ আল-মুসাভী আল খোমেইনী (রহ.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে)

বিশ্ব পরিস্থিতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধনে সিরিয়া গৃহযুদ্ধের আগুনে জ্বলছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধনে সিরিয়া গৃহযুদ্ধের আগুনে জ্বলছে

মো. মুনীর হোসেন খান

বিশ্ব-পরিস্থিতি এখন খুবই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। মিসরে এখন কার্যত তীব্র সংকটজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সামরিক অভ্যুত্থানে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মুরসীর অপসারণের পর সেদেশে সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত দমন অভিযানে এ পর্যন্ত সহস্রাধিক মিসরীয় নিহত হয়েছে। লিবিয়ার অবস্থাও ভালো না। সেখানেও গৃহযুদ্ধ লাগে লাগে অবস্থা। তিউনিসিয়ায়ও গোলযোগ লেগেই রয়েছে। বিগত দুই আড়াই মাস যাবৎ তুরস্কেও রাজনৈতিক গোলযোগ, বিক্ষোভ, মিছিল, সংঘর্ষ ও সহিংসতা চলছে। গত আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে সিরিয়ায় গোলযোগ চলছে। ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের অবস্থাও ভালো না। এদেশগুলোতে টেরোরিস্ট হামলা অহরহ সংঘটিত হচ্ছে এবং এর ফলে দেশগুলোয় প্রচুর সংখ্যক লোক নিহত ও আহত হচ্ছে। বাহরাইনে গণ আন্দোলন অব্যাহত আছে। ইঙ্গ-সৌদি-মার্কিন মদদপুষ্ট আল-খলিফা সরকার বাহরাইনে দমননীতি অব্যাহত রেখেছে।

সৌদি আরবের শিয়া অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে সৌদি রাজতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অবস্থাও তেমন একটা ভালো না। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই আজ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ হস্তক্ষেপের কারণে গোলযোগ, অস্থিরতা, সহিংসতা, রক্তপাত লেগেই রয়েছে। আসলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বজুড়ে পাশ্চাত্যপন্থীদের ও ইসলামপন্থীদের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অন্ততঃপক্ষে বিগত ছয় দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ তার আঞ্চলিক মিত্র ও ধামাধরাদের মাধ্যমে অর্থাৎ পাশ্চাত্যপন্থীদের মাধ্যমে সবকটি মুসলিম দেশে গণ্ডগোল জিইয়ে রাখছে। পাশ্চাত্য, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আল-কায়েদা ও তালিবানদের মতো উগ্রবাদী জংগী ও

সন্ত্রাসী দল ও সংগঠনগুলো সৃষ্টি করে মুসলিম দেশগুলোসহ সার্বিক বিশ্ব পরিস্থিতিকে খুবই জটিল করে দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবি যে, সে দেশটি আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী আল-কায়েদা ও তালিবানদের বিরুদ্ধে লড়ছে।

আবার এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই আল-কায়েদার সন্ত্রাসীদেরকে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে, এমনকি ইউরোপ থেকে বাশার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়ায় চালান দিচ্ছে। ইরাকেও সৌদি-ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ উদ্যোগে আল-কায়েদার সন্ত্রাসীদের আমদানি এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত বাথ পার্টির টেরোরিস্টদের পুনর্বাসিত করে ও প্রোটেকশন দিয়ে সে দেশটিতে সন্ত্রাসের বহ্নি শিখা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মার্কিনীদের কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল পেয়েই মিয়ানমার সরকার সে দেশের নিরীহ রোহিঙ্গা মুসলমানদের হত্যা করে যাচ্ছে। সংক্ষেপে এই হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের সাধারণ চিত্র।

এখন সিরিয়ার ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই। সর্বাগ্রে সিরিয়ার স্ট্র্যাটেজিক বা কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরতে চাই। লেবানন ও ফিলিস্তিনের সকল প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে ইরানের যোগাযোগের ব্রীজ বা পোল হচ্ছে সিরিয়া। আর এ দেশটি (সিরিয়া) ফিলিস্তিনি ও লেবাননি প্রতিরোধ আন্দোলনসমূহ, যেমন হামাস, জিহাদ-ই ইসলামী, পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন ও হিজবুল্লাহ আন্দোলনকে সব ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

তাই পাশ্চাত্য, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি আরব-কাতার (আরব প্রতিক্রিয়াশীল চক্র) চাইছে বাশার আসাদ প্রশাসনকে সরিয়ে সিরিয়ায় পাশ্চাত্যের বশংবদ তাঁবেদার সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে। আর তা করতে পারলে ইসরাইলবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর সাথে ইরানের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়বে এবং তখন ঐ সকল আন্দোলনের মূলোৎপাটনও সম্ভব হবে। আর এর ফলে ইসরাইলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে যা বর্তমানে ইরান-সিরিয়া ও ইসরাইলবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনসমূহ কর্তৃক বিগত কয়েক দশক যাবৎ প্রত্যক্ষ হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। তাই সিরিয়ায় গণতন্ত্র কায়েম করার বাহানায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তাদের বশংবদ তাঁবেদার ও তল্পীবাহক এ অঞ্চলের সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব আমীরাত বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্রসহ টেরোরিস্টদের সিরিয়ায় চালান দিয়ে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে সে দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিচ্ছে। বাশার আসাদ

সরকার মূলত দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েই এ সব বিদেশী সমর্থন ও মদদপুষ্ট বহিরাগত টেরোরিস্টদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আড়াই বছরেরও অধিক কাল যাবৎ এ যুদ্ধে বাশার আসাদ সরকার ও সিরীয় আরব সেনাবাহিনী দেশের অধিকাংশ স্থান থেকে ভাড়াটে বহিরাগত টেরোরিস্টদের বিতাড়িত করে যুদ্ধের গতিধারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে এবং যুদ্ধে বাশার আল আসাদ সরকারের সাফল্য ও বিজয়ের কথা কয়েক দিন আগে দৈনিক যুগান্তরেও প্রকাশিত হয়েছে।

তুরস্কের আর্দোগান প্রশাসন সিরিয়ায় গোলযোগ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সাথে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছে ও করে যাচ্ছে। যদি তুরস্ক সরকার এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে সাহায্য সহাযোগিতা প্রদান না করত, তাহলে পাশ্চাত্যের পক্ষে সিরিয়ায় গোলযোগ বাধানো সম্ভব হতো না। পাশ্চাত্য প্রধানত তুরস্কের মধ্য দিয়ে ২৮-এর অধিক দেশ থেকে ভাড়াটে টেরোরিস্টদের এনে তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্ত পথে সিরিয়ার ভিতরে পাঠাচ্ছে। এছাড়া পাশ্চাত্য অধিকাংশ অস্ত্র ও রসদপত্র এ তুরস্কের মধ্য দিয়েই সিরিয়ার অভ্যন্তরে টেরোরিস্টদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। তাছাড়া সিরীয় সীমান্তবর্তী তুর্কী ভূখণ্ডে বিভিন্ন ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন করে ভাড়াটে টেরোরিস্টদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা। সিরিয়ার বাশার আসাদ সরকারকে নৈতিক সমর্থন দিচ্ছে কেবল ইরান, রাশিয়া ও চীন। কার্যত বাশার আসাদ প্রশাসন সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়ছে। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব আমীরাতের অর্থ, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্ল্যান এবং তুরস্কের লজিস্টিক সাপোর্ট একযোগে কাজ করছে বাশার আসাদ প্রশাসনের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে।

গত বছর মিসরীয় দৈনিক সান্ধ্যকালীন আল-আহরাম (আল-আহরাম আল-মাসাঈয়াহ, আর এ পত্রিকাটি বাশার আল আসাদবিরোধী) লিখেছিল, 'কেন আজও বাশার আসাদ প্রশাসন টিকে আছে?' আর এ প্রশ্নের জবাব স্বয়ং এ পত্রিকাটি এভাবে দিয়েছে, 'সিরিয়ার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীষণ শঙ্কিত এ কারণে যে, যদি আসাদ প্রশাসনের পতন ঘটে তাহলে সে দেশে আল-কায়েদা ও ওয়াহাবি-তাকফিরি উগ্রবাদী টেরোরিস্টরা ক্ষমতা দখল করে সিরিয়ার ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহকে গণহত্যা করবে, তাদের অধিকারসমূহ হরণ করবে এবং তাদের ওপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার চালাবে। আর সিরিয়ার জনসংখ্যার প্রায় শতকরা

৩৫ ভাগ হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ভাষাভিত্তিক জাতিসমূহের (কুর্দি, তুর্কমান ইত্যাদি যারা সিরিয়ার জনসংখ্যার অন্তত শতকরা ১০ ভাগ) ঠিক একই আশঙ্কা। তাই দেখা যাচ্ছে যে, সিরিয়ার জনসংখ্যার কমপক্ষে প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ এ কারণে বাশার আসাদ প্রশাসনকে সমর্থন করে অথবা সমর্থন না করলেও চায় না যে, বাশার আসাদ প্রশাসনের পতন ঘটুক এবং তদস্থলে উগ্র জংগী টেরোরিস্টরা ক্ষমতা দখল করুক অথবা জংগীরা দেশের চূড়ান্ত ক্ষমতা দখল করতে না পারলেও সেদেশ যে সাদ্দামোত্তর ইরাকের মতো এক মহাভয়ঙ্কর অরাজকতা ও গোষ্ঠীগত, জাতিগত, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার শিকার হবে তা তারা চায় না। (আর ঠিক এর এক বছর পর অর্থাৎ ২০১৩ সালে জংগী উগ্র তাকফিরি সালাফী ওয়াহাবী টেরোরিস্ট সংগঠন জিবহাতুন নুসরা সিরিয়ার অনেক খ্রিস্টান ও কুর্দিকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।) বাকি শতকরা ৫৫ ভাগ জনগোষ্ঠী প্রধানত সুন্নি হলেও এদের অধিকাংশ সরকারী চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিধায় এদের অনেকেই চায় না বাশার আসাদ সরকারের পতন ঘটুক। কারণ, পতন ঘটলে সিরিয়ায় ব্যাপক ভয়ঙ্কর অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গোলযোগ, অশান্তি, রক্তপাত ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞ লেগেই থাকবে। বরং তারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে সেগুলো সবই ভেস্তে যাবে। সিরিয়ার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়– যাদের অধিকাংশই হচ্ছে সুন্নি মুসলমান তারাও চায় না যে, আসাদ সরকারের পতন ঘটুক। কারণ, পতন ঘটলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের আর কোন পরিবেশই বজায় থাকবে না।

এদিকে, খোদ বাশার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর মধ্যকার অনৈক্য, মতবিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদেরকে দুর্বল করে রাখছে। তাই দেখা যায় যে, দখলকৃত এলাকা ও অঞ্চলসমূহের নিয়ন্ত্রণভার নেওয়ার জন্য এসব বিদ্রোহী টেরোরিস্ট গোষ্ঠী ও দল নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যেমন ফ্রী সিরিয়ান আর্মির (FSA) সাথে জিবহাতুন নুসরার বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। তাই বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপ ও দলগুলো এ কারণেই আজ পর্যন্ত বাশার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ও কার্যকর কোন সামরিক (যুদ্ধ) কলাকৌশল (স্ট্র্যাটেজি) ও যৌথ সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারেনি (বিদ্রোহীরা তাদের দখলকৃত ও নিয়ন্ত্রিত এলাকাসমূহে জনগণের জান-মাল ও মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান তো দূরের কথা, নিজেরাই গণহত্যা, লুট-পাট ও ধর্ষণের মতো জঘন্য সব অন্যায়, অপকর্ম

ও দুষ্কর্মে লিপ্ত। আর এ কারণে তারা বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে ঐসব এলাকার অধিবাসীদের সমর্থন লাভ করতে পারেনি। এর ফলে সেসব অঞ্চল তারা সিরীয় সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে নিজেদের দখলে রাখতেও পারছে না)। এসব ভাড়াটে টেরোরিস্ট গোষ্ঠী ও গ্রুপের সামরিক প্রশিক্ষণ, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (combat capability & experience) সিরীয় সেনাবাহিনীর তুলনায় অনেক অনেক নিম্নমানের। আবার সিরিয়ার অভ্যন্তরে বাশার আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত গ্রুপ ও দলগুলোর মধ্যে ঐক্য নেই, ঠিক তেমনি বাশার আসাদবিরোধী প্রবাসী সিরীয় গ্রুপ ও দলগুলোর মধ্যেও কোন ঐক্য নেই। আর আমেরিকা ও তার মিত্ররা অনেক চেষ্টা-তদবির করেও এখন পর্যন্ত না প্রবাসে, না সিরিয়ার অভ্যন্তরে এসব গ্রুপ ও দলের মাঝে ঐক্য আনতে পারেনি।

এদিকে বাশার আসাদ সরকারের প্রতি লেবানন, ইরাক, ইরান, আলজেরিয়ার মতো এ অঞ্চলের বেশ কিছু রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাশিয়া ও চীনের মতো কতিপয় শক্তিশালী দেশের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সিরীয় সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে অধিকাংশ জোট নিরপেক্ষ দেশের আগ্রহ বাশার আসাদ সরকারের অবস্থান দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে এখন পর্যন্ত শক্তিশালী ও সুসংহত করেছে। আর জাতীয় পর্যায় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাশার আসাদের বিরুদ্ধে কার্যকর রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে পাশ্চাত্য ও তার বশংবদ এসব ভাড়াটে (টেরোরিস্ট) গ্রুপ ও দল।

আজ পর্যন্ত দামেশকসহ সিরিয়ার প্রধান প্রধান শহর ও নগরীগুলোয় বাশার আসাদবিরোধী বড় ধরনের কোন গণবিক্ষোভও ২০১২ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি যা হচ্ছে যে কোন স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটানোর জন্য পূর্বশর্তস্বরূপ (উল্লেখ্য যে, আজও অর্থাৎ ২০১৩ সালের আগস্ট মাস গত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও দামেশকে তো নয়ই, সিরিয়ার অন্য কোন বৃহৎ নগরীতেও বাশারবিরোধী কোন গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়নি)। ঐ পত্রিকাটি লিখেছে, মিসরের রাজধানী কায়রো ও অন্যান্য বৃহৎ নগরী, যেমন আলেকজান্দ্রিয়া, ইসমাঈলিয়া, আসিয়ুত, ফাইয়ূম ইত্যাদিতে লাগাতার গণবিক্ষোভ হওয়ার ফলে হুসনী মুবারক সরকারের পতন ঘটে। আর ঠিক এমনটি সিরিয়ার ক্ষেত্রে হয়নি। তাই বাশার আসাদ সরকার এখনও টিকে আছে। গত বছর এ কথাগুলো লিখেছিল ঐ পত্রিকাটি (আল-আহরাম আল-মাসাঈয়াহ)। এখন আমি

আরও কিছু কারণ উল্লেখ করব যা উক্ত পত্রিকাটি উল্লেখ করেনি। আর সেগুলো হচ্ছে :

বাশার আসাদ সরকার গণমুখী সরকার। তাই এ সরকারের ব্যাপক জনসমর্থন ও জনপ্রিয়তা রয়েছে। যদি এ সরকারের জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন না-ই থাকত, তাহলে এতদিন সৌদি-কাতারি-তুর্কি-ইঙ্গ-ফ্রাংক-মার্কিন-ইসরাইলি ষড়যন্ত্রের মুখে টিকে থাকতে পারত না। মিসর, তিউনিসিয়ার মতো কোন গণঅভ্যুত্থানও যে সিরিয়ায় হয়নি আল-আহরাম আল-মাসাঈয়াহর মতো আসাদবিরোধী পত্রিকাও অকপটে তা স্বীকার করেছে। গণঅভ্যুত্থানের মুখে কোন অজনপ্রিয় সরকার– তা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, টিকে থাকতে পারে না। ১৯৭৯ সালে ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর নেতৃত্বে সফল ইসলামী বিপ্লবের কাছে পাশ্চাত্য, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থনপুষ্ঠ শক্তিশালী শাহ সরকারের পতন, বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের গণ অভ্যুত্থানের কারণে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন এবং ২০১১ সালে তিউনিসিয়ায় গণ অভ্যুত্থানের ফলে জালেম স্বৈরাচারী যায়নুল আবেদীন বেন আলী সরকারের পতন ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট ও বাস্তব উদাহরণ।

সিরিয়ার ক্ষেত্রে আসলে বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, সিরীয় আরব বাহিনীর সাথে একাত্ম হয়ে সিরিয়ার জনগণও বহিরাগত এসব ভাড়াটে টেরোরিস্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করছে। তারা ভালো করে জানে যে, এসব উগ্র জংগী তাকফিরি টেরোরিস্ট হচ্ছে তাদের চিরশত্রু ইসরাইল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের আঞ্চলিক বশংবদ তল্পীবাহক সৌদি-কাতারি-কুয়েতি-আমীরাতি প্রতিক্রিয়াশীল রাজতান্ত্রিক সরকারগুলো এবং ইসরাইল-মার্কিন প্রদত্ত চশমা চোখে এঁটে তথাকথিত ওসমানি সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর তুর্কি প্রধানমন্ত্রী আর্দোগান (যার বাংলা অর্থ হচ্ছে শকুন) ও তুর্কী পররাষ্ট্র মন্ত্রী দাউদওগলূর চর, যাদের লক্ষ্যই হচ্ছে সিরিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করে সেদেশটিতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা। যার ফলে ইসরাইলের শক্তি ও প্রভাব সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে অক্ষুণ্ন ও অটুট থাকবে এবং এ দেশটির নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করা সম্পূর্ণ সম্ভব হবে। আর এর ফলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থ কোনরূপ হুমকির সম্মুখীন হবে না।

সিরীয় জনগণ এসব বাস্তবতা খুব ভালো করেই বোঝে। তারা ভালো করেই জানে যে, যে গণতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আঞ্চলিক মিত্রদের সহায়তায় সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে তাতে কোন কল্যাণ নেই। বাশার আসাদকে সরিয়ে সিরিয়ায় আসলে কোনদিনই আমেরিকা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না; বরং সিরিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের মোকাবিলায় দুর্বল করেই রাখবে। তাই বাশার আসাদকে সরিয়ে সিরিয়ায় পাশ্চাত্যপন্থী যে সরকারকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতায় বসাক না কেন, সিরিয়া আর কোনদিনই জাতীয় উন্নয়ন ও প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে না এবং সেখানে কোন দিন স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে না। সিরীয় জনগণ এটাও খুব ভালো করে বোঝে যে, যে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, আরব আমীরাতে পাশ্চাত্য বিশেষ করে মার্কিন মদতপুষ্ট সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক টোটালিটারিয়ান স্বৈরাচারী অত্যাচারী বর্বর মধ্যযুগীয় রাজতান্ত্রিক সরকারসমূহ ক্ষমতাসীন এবং নাগরিক অধিকারসমূহের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা দেখানো হয় না সেই সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত কিভাবে সিরিয়ায় বাশার আসাদকে স্বৈরাচার, একনায়কত্ব, জুলুম, অন্যায় ও অত্যাচারের ধুয়া তুলে উৎখাত করে সেদেশে গণতন্ত্র কায়েম করার জন্য পাশ্চাত্য ও মার্কিনীদের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে...।

বাহরাইনের অত্যাচারিত জনগণ দীর্ঘ আড়াই বছরেরও অধিক কাল ধরে ন্যায্য গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার আদায়ের দাবিতে বাহরাইনের স্বৈরাচারী জালেম রাজতান্ত্রিক আল-খলিফা সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলন করে যাচ্ছে এবং আল-খলিফা সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী ও দখলদার সৌদি সেনাবাহিনীর হাতে প্রতিনিয়ত হতাহত ও কারাগারে বন্দি হচ্ছে। বাহরাইনে সাংবিধানিক গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাজতান্ত্রিক আল-খলিফা প্রশাসনকে গণ আন্দোলনের মুখে পতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সৌদি সেনাবাহিনী সেদেশটি দখল করে নিয়েছে। আর আড়াই বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও সৌদি দখলদারিত্ব আজও অব্যাহত আছে। কেন তথাকথিত গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী পাশ্চাত্য তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব আমীরাত বাহরাইনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করে আদাজল খেয়ে সিরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে?... তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে, ডাল মেঁ কুছ কালা হ্যায়। সিরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অতীব জরুরি। আর কঠোর মধ্যযুগীয়

টোটালিটারিয়ান সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী রাজতান্ত্রিক সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব আমীরাত, বাহরাইনে গণতন্ত্রের প্রয়োজন নেই। আর ঠিক এটাই হচ্ছে পাশ্চাত্য তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নীতি। যে সরকার ও প্রশাসন পাশ্চাত্য তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ স্বার্থ রক্ষা করবে সে যতবড় অত্যাচারী-স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক হোক না কেন, যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় মিত্র। আর এ কারণেই ১৯৫৩ সালে ইরানের নির্বাচিত মোসাদ্দেক সরকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের সহায়তায় সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পতন ঘটিয়ে স্বৈরাচারী শাহকে পুনরায় ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কারণ, মোসাদ্দেক সরকার ইরানের তেল শিল্প জাতীয়করণ করে ব্রিটেনের জন্য ইরানি তেল সম্পদ লুণ্ঠন করার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই এ কারণে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও হতভাগ্য মোসাদ্দেক সরকার ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র রোষানলে পড়েছিল। (সম্প্রতি সি.আই.এ ষাট বছর পরে ১৯৫৩ সালে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মোসাদ্দেক সরকারের পতনে নিজেদের ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে। তবে ইরানের কাছে এ জন্য ক্ষমা চায়নি বা দুঃখ প্রকাশও করেনি।)

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সৌদি, কাতারি, কুয়েতি, বাহরাইনি, আমীরাতি রাজতান্ত্রিক সরকারসমূহ এ অঞ্চল তথা গোটা মুসলিম বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ স্বার্থ সংরক্ষণ করছে বিধায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে এসব অগণতান্ত্রিক (রাজতান্ত্রিক) সরকারের মিত্র ও রক্ষক। আর সিরিয়ার বাশার আসাদ সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যূনতম স্বার্থ রক্ষা করা তো দূরের কথা, ইসরাইলের সাথে শান্তি আলোচনায় বসেনি; বরং ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত সকল ফিলিস্তিনি ও লেবাননি আন্দোলনকে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও অত্যাচারিত-বঞ্চিত ফিলিস্তিনি জনগণের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে বাশার আসাদ প্রশাসন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাথে একমত এবং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইরানের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

আর এর ফলশ্রুতিতে ২০০৬-এ হিজবুল্লাহ-ইসরাইল যুদ্ধ, ২০০৮-২০০৯ সালে প্রথম গাজা-ইসরাইল যুদ্ধ এবং ২০১২ সালে দ্বিতীয় গাজা-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল ন্যাক্কারজনকভাবে পরাজয় বরণ করে। তাই বাশার আসাদ ও তার সরকার যে পাশ্চাত্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চক্ষুশূল হবে, তা নিতান্ত স্বাভাবিক। আর এ বিষয়টি

সিরীয় জনগণ খুব ভালোভাবে বোঝে ও উপলব্ধি করে। স্মর্তব্য যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অনেক গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়ে সেদেশগুলোয় অগণতান্ত্রিক-স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। কারণ, ঐসব হতভাগ্য গণতান্ত্রিক সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবৈধ স্বার্থ সংরক্ষণ করত না, অথচ অগণতান্ত্রিক সরকারগুলো অবৈধ মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষণ করতে প্রস্তুত ছিল। তাই তাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিল।

(গত জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইশারা-ঈঙ্গিতেই মিসরীয় সেনাবাহিনী অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নির্বাচিত মুরসী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে।) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। এখন পর্যন্ত পাশ্চাত্য তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতীতের মতোই বুনো ও রক্তপিপাসু রয়ে গেছে। আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসন ও সে দেশগুলো জবর-দখল করে মিলিয়ন মিলিয়ন আফগানি ও ইরাকি জনগণকে হত্যা পাশ্চাত্য তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্তপিপাসু চরিত্রকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

সিরীয় আরব সেনাবাহিনীর হাতে পাশ্চাত্যের ভাড়াটে টেরোরিস্টদের বার বার পরাজয়বরণ ও নাস্তানাবুদ হওয়ার কারণে সর্বশেষ প্রচেষ্টাস্বরূপ পাশ্চাত্য এখন বাশার আসাদ সরকারকে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে বলে অভিযুক্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ, এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইরাক ও আফগানিস্তানের মতো সিরিয়ার বিরুদ্ধেও এক সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে। আর তখন বাশার আসাদের পতন ঘটানো সম্ভব হবে। আসলে সিরীয় সেনাবাহিনী নয়; বরং মার্কিন ও পাশ্চাত্য মদতপুষ্ট মানব হৃদপিণ্ড, কলিজা ও মাংস ভক্ষণকারী এসব উগ্রবাদী টেরোরিস্ট সৌদি আরব, কাতার ও জার্মানি কর্তৃক সরবরাহ করা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে। গত মে মাসে বাশার আসাদবিরোধী টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোই যে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে তা জাতিসংঘের তদন্তকারী টিম প্রদত্ত রিপোর্টে সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেছিল। অথচ ওয়াশিংটন এ রিপোর্টটা প্রত্যাখ্যান করেছে। এর আগে এ বছরের (২০১৩) ১৫ জানুয়ারি ব্রিটেনের ডেইলী মেল পত্রিকা লিখেছিল যে, বিদ্রোহী গ্রুপগুলো পাশ্চাত্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সরবরাহকৃত রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে এর দায়ভার বাশার আসাদ সরকারের ঘাড়ে চাপাবে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঠিক এ কাজটাই করতে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের সকল

করপোরেট প্রচার মাধ্যমগুলোও (যাদের অধিকাংশের মালিক হচ্ছে বড় বড় ইহুদি যায়নবাদী পুঁজিপতি) এখন প্রভুদের নির্দেশে বাশার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ জোরেশোরে প্রচার করছে আর ঘূণাক্ষরেও বলছে না যে, বিদ্রোহীরা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। তাই এ ধরনের নির্জলা মিথ্যা প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার কারণে বিশ্ব জনমত বহুলাংশে দারুণভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে। তাই প্রকৃত অবস্থাটি জানা আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন। যখন জয়লাভের পথ চূড়ান্তভাবে রুদ্ধ হয়ে যায় ঠিক তখন পরাজিত পক্ষ রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে নিজেদেরকে বাঁচানোর লক্ষ্যে। যেখানে সিরীয় সেনাবাহিনী বিভিন্ন ফ্রন্টে জয়লাভ করছে সেখানে কেন তারা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে অহেতুক শত্রু পক্ষকে বাড়তি সুবিধা প্রদান করবে এবং বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা ও প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালানোর সুযোগ করে দেবে?... যেহেতু বাশার আসাদের বিরোধীদের যুদ্ধে বিজয় লাভ করার সম্ভাবনা নেই অথবা অত্যন্ত ক্ষীণ, সেহেতু তারা হয় প্রাণে বাঁচার জন্য অথবা যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে। সম্প্রতি সিরীয় আরব সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের একটি ঘাঁটি থেকে বিপুল পরিমাণে সৌদি আরব, কাতার ও জার্মানির তৈরি রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, যেগুলো রাসায়নিক অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাশার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এই বিদ্রোহীদের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণিত হলো :

১. বিদ্রোহীদের অধিকাংশই হচ্ছে তাকফিরি টেরোরিস্ট গ্রুপসমূহ, যেমন আল-কায়েদার মতো জিবহাতুন নুসরা সংগঠনের সদস্য।

২. এদের অধিকাংশ বহিরাগত অর্থাৎ বিদেশী এবং তারা সিরিয়ার অধিবাসী নয় (প্রায় ২৮টির অধিক দেশ থেকে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কথা বলে এদেরকে আনা হয়েছে এবং এদেরকে সৌদি দরবারি ওয়াহাবি মুফতীরা ফতোয়া জারি করে বলেছে যে, বাশার আসাদ ও তার সরকার এবং তাদের যারা সমর্থন করে তারা এবং শিয়ারা সবাই কাফির এবং এদের হত্যা করা ফরজ। এদের প্রত্যেককেই মাসিক ১০০০-১৫০০ ডলার বেতন দেয়া হয়। এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব আমীরাত যোগান দিয়ে যাচ্ছে। এসব টেরোরিস্ট যেসব অঞ্চল দখল করেছে সেখানেই নৃশংস ও জঘন্য হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কাউকে এরা রেহাই দেয়নি। শুধু তাই নয়, হত্যা করে নিহতদের বুক ও পেট চিড়ে

হৃদপিণ্ড, কলিজা ইত্যাদি বের করে এনে চিবিয়ে খেয়েছে এবং এসব দৃশ্যের সচিত্র ভিডিও ফুটেজও এরা প্রকাশ করেছে ইন্টারনেটে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুনকে বলেছিলেন, 'আপনারা কি সিরিয়ায় নরখাদকদেরকে (man-eaters) অস্ত্র দিচ্ছেন যারা মানুষের হৃদপিণ্ড কলিজা চিবিয়ে খায়?...' অতঃপর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পুতিনের এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেননি। আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা নিজ স্বার্থ হাসিল করার জন্য রাসায়নিক ও নিষিদ্ধ অস্ত্র, এমনকি নরখাদকদেরকেও ব্যবহার করতে কুণ্ঠা ও দ্বিধাবোধ করে না। তাই গণতন্ত্র-অগণতন্ত্র, রাজতন্ত্র-স্বৈরতন্ত্র-একনায়কতন্ত্র– যেটা দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি ও কাজ উদ্ধার হয় সেটারই তারা সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করবে। তাই পাশ্চাত্যের স্বার্থোদ্ধার করতে গিয়ে যদি জাতিসমূহের ন্যায্য স্বার্থেরও জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহলে সেটাই করতে হবে। পাশ্চাত্য বাঁচলে পৃথিবী বাঁচবে। পাশ্চাত্যের স্বার্থ ও অধিকার অন্য সকল জাতির স্বার্থ ও অধিকারের উর্ধ্বে। তাই পাশ্চাত্যের বেদীমূলে সকল জাতির সব কিছুই উৎসর্গ করতে হবে। আর ঠিক এটাই হচ্ছে পাশ্চাত্যের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি। যা হোক এখন আমরা পুনরায় মূল আলোচনায় ফিরে যাব।

৩. এসব তাকফিরি টেরোরিস্ট যারা নিজেদেরকে জিহাদী বা মুজাহিদ বলে দাবি করে, তারা সিরিয়ার পাশেই অবস্থিত ইসরাইলের দিকে ভুলেও একটি গুলি ছোঁড়েনি। একজন ইসারাইলি সৈন্যকেও হত্যা করেনি। অথচ এসব সৌদি-কাতারি-তুর্কি-মার্কিন-ইঙ্গ-ফরাসি-জার্মান সমর্থনপুষ্ট তাকফিরি (সালাফি) ওয়াহাবী টেরোরিস্ট যেমন পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরাকে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করছে– যারা ওয়াহাবী মতাবলম্বী নয়, ঠিক তেমনি তারা গত আড়াই বছর যাবৎ সিরিয়ায় হাজার হাজার মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেই চলেছে।

৪. এসব বিদ্রোহী ও তাকফিরি ওয়াহাবী (সালাফি) টেরোরিস্ট গ্রুপ ও সংগঠন যেমন সৌদি-কাতারি-তুর্কি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সমর্থিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত, ঠিক তেমনি তারা সাম্রাজ্যবাদী বিধর্মী পাশ্চাত্য কর্তৃকও সমর্থিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত।

৫. এরা সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠুর, হিংস্র ও পাশবিক চরিত্রের; বরং পশুর চেয়েও অধম। কারণ, এদের অনেকেই বন্দিদের হত্যা করে তাদের দেহ চিড়ে ফেড়ে হৃদপিণ্ড, কলিজা ইত্যাদি চিবিয়ে খেয়েছে, যা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি।

৬. এদের প্রতি আপামর সিরীয় জনগণের কোন সমর্থন নেই।

৭. এদের নিজেদের মধ্যেও কোন ঐক্য নেই, আর এ কারণে এরা প্রায়ই পরস্পর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আর খোদা না করুন, বাশার আসাদ সরকারের পতন হলে এই টেরোরিস্ট দলগুলোর মধ্যে আরও সর্বাত্মক, ব্যাপক ও স্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধ চলতে থাকবে যে, এর ফলে যেমন আমেরিকার জবরদখলের পর আফগানিস্তান ও ইরাকে কখনো শান্তি ফিরে আসেনি এবং ইরাক এখন কার্যত স্ব-শাসিত কুর্দিস্তান অঞ্চল এবং কেন্দ্র শাসিত আরব অঞ্চল– এ দুভাগে বিভক্ত (গাদ্দাফীর পতনোত্তর লিবিয়াকে কার্যত পরস্পর বৈরী তিন অঞ্চলে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে এবং বেশ কিছুকাল আগে থেকেই সুদানকেও উত্তর ও দক্ষিণ এ দু অংশে বিভক্ত করা হয়েছে), ঠিক তেমনি সিরিয়াও কার্যত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্ত অঞ্চলের মধ্যে পাশ্চাত্য ইচ্ছা করেই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও বিবাদ লাগিয়ে রাখবে। যার ফলে সেখানে আর কোনদিনই স্থায়ী শান্তি ফিরে আসবে না। আর সেই সাথে বিভক্ত সিরিয়া তখন সন্ত্রাসবাদের অভয়ারণ্য ও অবাধ চারণক্ষেত্রে পরিণত হবে। যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যসহ গোটা বিশ্বই মারাত্মক হুমকি ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার হবে এবং এভাবে বিশ্ব শান্তিও চরমভাবে বিপন্ন হবে। আর সিরিয়া সংক্রান্ত মার্কিন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তুরস্ক, সৌদি আরব, মিসর, আলজেরিয়া, ইরান, ইয়েমেন, পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ এ অঞ্চলের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো করার বেদাত চালু করার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে পাশ্চাত্য তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর সম্ভবত এটাই হচ্ছে সাবেক বুশ প্রশাসন কর্তৃক উপস্থাপিত বৃহৎ মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনা (GREATER MIDDLE EAST PLAN) যার আওতায় রয়েছে মরক্কো থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সকল মুসলিম রাষ্ট্র। একবার বৃহৎ রাষ্ট্র বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে রাশিয়া, ভারত, চীনের মতো বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোও পাশ্চাত্যের উসকে দেয়া বিচ্ছিন্নতাবাদ ও দেশ-বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়ার শিকার হয়ে যেতে পারে। আর এ ধরনের একটা কিছু করতে পারলে সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ লুণ্ঠন, বিভিন্ন জাতি ও দেশ থেকে সুলভ ও সস্তা শ্রমশক্তির ব্যবহার ইত্যাদি তখন পাশ্চাত্যের জন্য পানি পান করার চেয়েও সহজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তখন পাশ্চাত্য সমগ্র বিশ্বকে নতুন ধরনের পরাধীনতা ও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারবে।

মধ্যপ্রাচ্য ও সিরিয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি

গত ২১ আগস্ট দামেশকের উপকণ্ঠের এক শহরতলীতে রাসায়নিক হামলা চালানো হলে প্রায় আনুমানিক ১৪০০ ব্যক্তির প্রাণহানি হলে সিরীয় সংকট বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আর এর ফলে বাশার আসাদ সরকারের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ দলিল-প্রমাণ পেশ না করেই কেবল একতরফা দাবির ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফান্স জাতিসংঘের তদন্তকারী দলের রিপোর্ট ও নিরাপত্তা কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগেই বাশার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এক ইসরাইলী সংবাদপত্র (মাআরীব গত ২৮ অগাস্ট, ২০১৩) জানিয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ২৯-৮-২০১৩, সিরিয়ায় বাশার আসাদ সরকারের সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদের গুদাম ও ভাণ্ডারসমূহের ওপর সীমিত পর্যায়ের বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা (LIMITED AIR & MISSILE STRIKES) চালাতে পারে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাশার আসাদ সরকারের অ্যালেজড রাসায়নিক অস্ত্র ও শক্তি ধ্বংস করা।

অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, এ ধরনের সীমিত আঘাত বাশার আসাদ সরকারকে ধরাশায়ী করতে পারবে না। কারণ, এ ধরনের সামরিক পদক্ষেপ ফলপ্রসূ ও কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ঠ সন্দেহ রয়েছে। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা সীমিত হামলা নয়; বরং লিবিয়ায় ন্যাটোর ব্যাপক বিমান আক্রমণের অনুরূপ সিরিয়ায় ব্যাপক বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ চালানোর পাঁয়তারা করছে যাতে মার্কিন ও মিত্র শক্তির তীব্র বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ছত্রছায়ায় বিদ্রোহীরা ব্যাপক স্থলযুদ্ধ ও আক্রমণ চালিয়ে দামেশক দখল করে বাশার আসাদের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়। আর এ প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাশার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করাতে চাচ্ছে। এ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল দাবিই করে আসছে যে, বাশার আসাদ সরকার কর্তৃক বিদ্রোহীদের ওপর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের সাক্ষ্য-প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত মার্কিনীরা যে জাতিসংঘের কাছে তা উপস্থাপন করেনি সে কথা জাতিসংঘের সিরিয়া বিষয়ক প্রতিনিধি লাখদার ব্রাহিমী (আখদার ইব্রাহীমী) গত ২৮ আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছে যে, দামেশক অনেক দেরী করে জাতিসংঘের তদন্তকারী টিমকে সিরিয়ায় আসার অনুমতি দিয়েছে। আর এই সুযোগে দামেশক যেসব এলাকায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে সেসব এলাকা থেকে রাসায়নিক অস্ত্রের সমুদয় চিহ্ন ও নিদর্শন মুছে ফেলেছে। কিন্তু জাতিসংঘের রাসায়নিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোন এলাকায় সারিন গ্যাসের মতো রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হলে সে এলাকায় উক্ত রাসায়নিক অস্ত্রের চিহ্ন কয়েক মাস পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। আর দামেশক কোন ধরনের বিলম্ব না করেই সাথে সাথে জাতিসংঘের তদন্তকারী টিমকে সিরিয়ায় আসার অনুমতি দিয়েছে। বাশার আসাদ প্রশাসন এ ক্ষেত্রে সবসময় জাতিসংঘের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে আসছে। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিদ্রোহী গ্রুপগুলো, অপরাধীকে শনাক্ত করার ব্যাপারে অতীতেও যেমন কোন ধরনের সহযোগিতা করেনি, তেমনি বর্তমানেও তা করছে না। বর্তমানে সিরিয়ায় অবস্থানরত জাতিসংঘের তদন্তকারী দল দামেশকের উপকণ্ঠের বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় এখনো পর্যন্ত যেতে পারেনি। কারণ, বিদ্রোহীরা তদন্তকারী দলকে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় তদন্ত করার জন্য যেতে দিচ্ছে না। উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার। এসব বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় তদন্ত সম্পন্ন করা না গেলে জাতিসংঘের তদন্তকারী টিমের রিপোর্ট হবে অস্পষ্ট (দ্ব্যর্থতাবোধক) ও অপূর্ণাঙ্গ। আর তখন এর গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং মনগড়া যে কোন ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর সুবর্ণ সুযোগও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এসে যাবে। আর জাতিসংঘের তদন্তকারী টিমও যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের চাপে পড়ে উল্টা-পাল্টা, অবস্তুনিষ্ঠ (মিথ্যা), ভিত্তিহীন ও অমূলক রিপোর্ট পেশ করে তাহলেও তাতে বিস্মিত ও অবাক হওয়ার কিছু নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যা দাবির ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে যে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে তার ভুরি ভুরি নজির ও দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। পারমাণবিক অস্ত্র আছে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ ও সে দেশ জবরদখল করে। বিবিসি বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিক জনাব সিরাজুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী প্রায় ১২ থেকে ১৩ লাখ নিরীহ ইরাকীকে তারা হত্যা করেছে (এক জীবন এক ইতিহাস, ভূমিকার ৪র্থ পৃষ্ঠা দ্র.)। অথচ আজ (২০১৩ সাল) পর্যন্ত ইরাকে সেই নিষিদ্ধ পারমাণবিক অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উক্ত দাবি যে সর্বৈব মিথ্যা ছিল তা আজ প্রমাণিত। ঠিক একইভাবে ১৮৯৮ সালে মিথ্যা অভিযোগ ও দাবির ভিত্তিতে

তদানীন্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল। গত বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ ১৩-১৪ বছরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভিয়েতনাম যুদ্ধও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সাজানো সিনারিও-এর ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছিল যাতে প্রায় ষাট লাখ হতভাগ্য ভিয়েতনামি আগ্রাসী ও দখলদার মার্কিন সেনাবাহিনী ও মার্কিনীদের ভাড়াটে চরদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল। কিন্তু আজও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই রক্তপিপাসু ও ষড়যন্ত্রকারী স্বভাব ও চরিত্রের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স আজ সিরিয়ার বিরুদ্ধে ইরাকের মতো সেই একই সিনারিও-এর পুনরাবৃত্তি ঘটাতে যাচ্ছে। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, এবার সিরিয়ার বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের মিথ্যা অভিযোগ ও দাবি উঠানো হয়েছে। ২৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার, খবরে প্রকাশ, তেল আবিবে দামেশকে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছেন, সিরিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলা অবশ্যম্ভাবী। আর তা জাতিসংঘের তদন্তকারী দলের নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট পেশ করার আগেই সংঘটিত হতে পারে। তবে ব্রিটেন চাচ্ছে জাতিসংঘের তদন্তকারী দলের সিরিয়া থেকে ফিরে এসে রিপোর্ট পেশ করার পর নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক সিরিয়া সংক্রান্ত গৃহিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিরিয়া আক্রমণের পদক্ষেপ নিতে।

৩১ অগাস্ট তদন্তকারী দলের সিরিয়া ত্যাগ করার কথা। আর যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ন্যাটো সিরিয়ার ওপর সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে, তাহলে তা হবে বারুদের স্তূপে আগুন লাগানো যা বিস্ফোরিত হলে এ অঞ্চল কেন, সমগ্র বিশ্ব সেই অনলে জ্বলতে থাকবে। এ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে ১০০০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা সিরিয়ার ওপর হামলা চালালে ইরাকের মতো সে দেশের আরো লাখ লাখ লোকের প্রাণহানি এবং মিলিয়ন মিলিয়ন লোক উদ্বাস্তু ও শরণার্থিতে পরিণত হবে এবং হতভাগা সিরীয় জনগণের দুঃখদুর্দশার যে অন্ত থাকবে না তাতে কোন সন্দেহ নেই। সম্প্রতি ইসলামী বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ ইমাম খামেনেয়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সিরিয়া আক্রান্ত হলে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারকে রেড লাইন হিসেবে ঘোষণা করে বলেছিল, বাশার আসাদ সরকার যদি বিদ্রোহীদের এবং সাধারণ নিরীহ জনগণের ওপর রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র বাশার আসাদ সরকারের ওপর আক্রমণ চালাবে। কারণ, পাশ্চাত্যের বয়ান অনুসারে ইরান-ইরাক যুদ্ধ চলাকালে (ইরানি বাহিনী ১৯৮৮ সালের

মার্চ মাসে এক সফল অভিযান চালিয়ে ইরাকি কুর্দিস্তানের হালাবজা শহর দখল করলে) সাদ্দামের সেনাবাহিনী উক্ত শহরে ব্যাপকহারে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার করলে হাজার হাজার নিরীহ কুর্দি নারী-পুরুষ ও শিশু প্রাণ হারিয়েছিল এবং উক্ত রাসায়নিক হামলায় কয়েক হাজার ইরানি সৈন্যও হতাহত হয়েছিল। কিন্তু এ অপরাধের জন্য সাদ্দামের শাস্তি না হওয়ায় বাশার আসাদ প্রশাসনের সাহস (স্পর্ধা) বেড়ে গেছে বিধায় এখন মরিয়া হয়ে তারা দেশের নিরীহ জনগণের ওপর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেই যাচ্ছে। তাই বাশার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিলে এই বাশার আসাদ সরকার যেমন ভবিষ্যতে এর চাইতে আরো ব্যাপকহারে ও বিপুলমাত্রায় রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করবে ঠিক তেমনি অন্যান্য দেশের ডিক্টেটররাও তা ব্যবহার করার সাহস পেয়ে যাবে। অথচ অনেক প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হয় যেগুলোর উত্তর থেকে পাশ্চাত্যের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নীতি ও মুনাফিকি স্পষ্ট হয়ে যায়।

আর এ প্রশ্নগুলোর একটি হচ্ছে : ...কে বা কারা সাদ্দামকে রাসায়নিক অস্ত্র এবং তা উৎপাদন করার উপকরণ, প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল? এ প্রশ্নের উত্তর সবার জানা। পাশ্চাত্যের দেশগুলোই অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড ইত্যাদি সাদ্দামকে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্রসস্ত্রে পূর্ণ সজ্জিত করেছিল। ইরান সে সময় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অগণিত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেও কোন সুবিচার পায়নি এবং সাদ্দামেরও কোন সাজা হয়নি। কারণ, সাদ্দামের শাস্তি মানে পাশ্চাত্যেরও শাস্তি। তাই কোন অপরাধী কি নিজেকে নিজের অপরাধের শাস্তি দেবে, অথচ রাসায়নিক অস্ত্র নয়; বরং গোপন পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির ধুয়ো তুলে ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ইরাক আক্রমণ করে। উল্লেখ্য যে, ইরান-ইরাক যুদ্ধের সূচনালগ্নেই ইসরাইলের বিমান হামলায় ইরাকের পারমাণবিক কর্মকাণ্ড সমূলে ধ্বংস হয়েছিল। আর সৌদি আরব ও জর্দান এ ক্ষেত্রে ইসরাইলকে গোপন সহায়তা প্রদান করেছিল। আর ঐ আক্রমণের পর থেকে কার্যত ইরাকের পারমাণবিক কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়ে। তাই ইরাক জবরদখলের পর বহু বছর গত হয়ে গেলেও সে দেশে আজও কোন পারমাণবিক অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। যদি গোপন রাসায়নিক অস্ত্রের কর্মসূচি থাকার অজুহাত দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ইরাক আক্রমণ করত তাহলে নিঃসন্দেহে অন্তত রাসায়নিক অস্ত্রের কিছু ধ্বংসাবশেষ তো ইরাকে পাওয়া যেত। অথবা তখনই হয়তো

প্রশ্ন উঠত ইরাক কিভাবে রাসায়নিক অস্ত্রের অধিকারী হয়েছে এবং কোন কোন দেশ এ ক্ষেত্রে ইরাককে সাহায্য করেছে। খোদ পাশ্চাত্যই এমতাবস্থায় ফেঁসে যেত আর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাদ্দাম ও তার পশ্চিমা প্রভুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও মামলা দায়ের করার সুযোগ পেয়ে যেত। তাই পাশ্চাত্য কি এ ধরনের আত্মঘাতি কাজ করবে? সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের মিথ্যা অভিযোগ এনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা বাশার আসাদ সরকারের ওপর মারণাঘাত হানার চেষ্টা করছে, অথচ কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা সাদ্দামকে পাশ্চাত্যের যেসব দেশ ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র যোগান দিয়েছিল অথবা রাসায়নিক অস্ত্র নির্মাণের প্রযুক্তি, উপায়-উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেছিল তাদের সাজা দেওয়ার কথা তুলছে না? যদিও সাদ্দাম নেই, কিন্তু ঐসব দেশ তো আজও বহাল তবিয়তেই আছে। আর সিরিয়ায় বিদ্রোহীদের কাছে ঐসব দেশই রাসায়নিক অস্ত্রের সরাসরি যোগান দিয়েছে নতুবা রাসায়নিক অস্ত্র নির্মাণের প্রযুক্তি, উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেছে। আর বিদ্রোহীরা তা ব্যবহার করেছে এবং করে যাচ্ছে। আর এই সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই বাশার আসাদ সরকারকে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অপরাধে অভিযুক্ত করছে। তাই এ সবকিছু থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখা, অবৈধ স্বার্থ সিদ্ধি এবং ইসরাইলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স লাখ লাখ সিরীয়বাসীকে হত্যা করে হলেও বাশার আসাদ সরকারকে ক্ষমতচ্যুত করে সে দেশে নিজেদের তাঁবেদার পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা করছে।